

প্রতীচী The West ১৪৩০

পূজা ও প্রযুক্তির জগতে নতুন দিগন্ত

প্রতীচী

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৩

Bengali Association of Greater Atlanta



Suvidha
INTERNATIONAL MARKET
The convenience you can trust!



Suvidha wishes you a

HAPPY DUSSEHRA &

DURGA PUJA



POOJA SAMAGRI & FESTIVE FOODS AVAILABLE

SUVIDHA INTERNATIONAL MARKET

International Groceries | Garden Fresh Vegetables | Pooja Samagri
Frozen Foods from All Leading Brands | Unmatched Selection & Service

SUWANEE, GA
3495 Peachtree Parkway, Ste 105
Suwanee, GA 30024
Ph: 770 292 1992

MARIETTA, GA
2821 Chastain Meadows Pkwy. NW.
Marietta, GA - 30066
Ph: 770 419 7112

ALPHARETTA, GA
670 N. Main St., #113
Alpharetta, GA - 30004
Ph: 770 999 9585

HONDA | HondaCarland

Carland
SERVICE CENTER

One Name, Two Convenient Locations

DRIVE CONFIDENT WITH CARLAND

LABOR DISCOUNT

20% OFF ON VEHICLES UNDER 100K MILES

30% OFF ON VEHICLES OVER 100K MILES

Plus tax and any applicable fees. Up to maximum $75 total discount. Must present coupon at time of write-up. Not applicable for accessory labor. Cannot be used on maintenance items, tire labor, and alignments. All of which are already discounted. Speak with an advisor for details.

FULL SYNTHETIC OIL CHANGE

$20 OFF

Up to 5qts of oil. Honda Vehicles Only. Must present coupon at time of write-up. We reserve the right to confirm coupon and price. Plus tax and shop fees. Cannot combine offers. This offer cannot be used on a service or repair that is already discounted.

DIAGNOSTIC CHECK SPECIAL

FREE

CHECK ENGINE LIGHT DIAGNOSTIC CHECK

Plus tax and any applicable fees. Must present coupon at time of write-up. Not applicable for accessory labor. Cannot be used on maintenance items, tire labor, and alignments. All of which are already discounted. Speak with an advisor for details.

Visit Honda Carland and Carland Service Center to schedule service and additional savings!



Honda Carland
11085 Alpharetta Highway, Roswell, GA 30076
Sales Hours: M-Sat 9a-8p • Sun 12p-6p
Service & Parts Hours: M-Fri 7a-7p • Sat 7a-5p • Sun Closed
Sales: 470-235-2084 **Service:** 770-998-2327 **Parts:** 770-641-8807
www.HondaCarland.com

Carland Service Center
11300 State Bridge Road, Alpharetta, GA 30022
(678) 624-0050
Store Hours: M-Fri 7a-7p • Sat 7a-5p • Sun Closed
www.CarlandService.com



Disclaimer: *The statements and opinions contained in the advertisements and writings are solely those of the advertisers/authors and do not necessarily reflect those of the editors or the publisher. Images and art used in this magazine have been either legally generated using AI or limited to sourcing public-domain, royalty-free materials from the Internet. BAGA assumes no legal responsibility for copyright infringement around republishing, reprinting, or resale of any originals published in Pratichi; such protective actions remain the sole discretion and responsibility of the participating authors or artists. The appearance of advertisements in this publication is not a warranty, endorsement or approval of the products or services advertised or of their safety. The editors and the publisher disclaim responsibility for any injury to persons or property resulting from any ideas or productions referred to in the articles or advertisements. Moreover, BAGA reserves the discretion and right to accept, or reject any creation submitted with or without cause. BAGA assumes implicit permission for publishing any photograph of the participant or contributor including digital media, unless a written objection is made by the participant or his/her guardians before the publication. BAGA desires to distribute a copy of printed Pratichi to all contributors but can't guarantee that all contributors will receive a copy.*

Contents

Editorial, 1
President's Message, 3
Executive Committee 2023, 4
Past Executive Committee, 120
Board of Directors, 5
Sports Committee, 6
Youth Committee, 8
Puja Committee, 121
BAGA Financials 2023, 119
Donations, 122

গল্পের দুনিয়া

সোনার বালা - সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 11
অন্য সময়, অন্যরকম উৎসব - ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, 25
সাঁকো - সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, 32
ডিভোর্সী - দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, 35

কবিতার সফর

বর্ষার গান - শ্রীজাত, 23
ভালোবাসার জন্য - রুদ্রশংকর, 41
দেবী - সংযুক্তা রায়, 55
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা - সজল চট্টোপাধ্যায়, 62
কান্নার স্বাদগন্ধ - অনুপকুমার আচার্য, 71

কলমের জাদু

রোবটের রূপকথা - রবীন্দ্র চক্রবর্তী, 42
সাহা বাড়ির মনসা পূজো - সুব্রত ভট্টাচার্য, 46
প্রতীক ও প্রতীতি - অনিল চক্রবর্ত্তী, 48
প্রবাদের পতন - সমর মুখোপাধ্যায়, 51
মাতৃত্ব - রিমি পতি, 58
স্ট্রাইকার - সন্দীপ সাহা, 63
কফি হাউসের গদ্য - মহুয়া ঘোষ, 65
অপরাজিতা - মানস দে, 67

Kids' Corner

A Memorable Volunteer Experience - Saptanshu Maji, 74
My Experience on Moving to Georgia - Sania Sharma, 76
Horse - Adrija Chakraborty, 78
My Memorable Trip to India - Aarin Thakurta, 79

The Writer's Craft

Advaita Vedanta for the Beginners - Indira Bhowal, 83
Bengali Adda - Kinsuk Maitra, 87
The Conch Shells of Mahalaya - Shib Nath Sen, 91
On Hinduism - Asit Narayan Sengupta, 95
Inferno of the Century - Tapan Baksi, 98
Behavior Therapy - Oyindrila Basu, 102

Poetic Gems

Kurukshetra and Nonviolence - Niranjan Talukder, 90
Finding ME - Payel Bhattacharyya, 101

Art & Photography, 109
Kid's Art Gallery, 115



সম্পাদক মন্ডলী
মালবিকা (নীতা) বোস
রবীন্দ্র চক্রবর্তী
অনিল চক্রবর্তী
সজল চট্টোপাধ্যায়
প্রশান্ত হাজরা
তনুশ্রী গুহ
মৌমি পাঁজা
সংযুক্তা রায়
পারমিতা ঘোষ

Editors
Malabika (Nita) Bose
Rabindra Chakrabarty
Anil Chakraberti
Sajal Chattotpadhyay
Prosanto Hazra
Tanushree Guha
Moumi Panja
Sanjukta Roy
Paromita Ghosh

ছোটদের প্রতীচী
মৌমিতা দত্ত

Children's Pratichi
Moumita Dutta

প্রকল্প সহায়ক
অভিজিৎ ঘটক
শঙ্কর ঘোষ
অভিষেক মল্লিক
অমিত পোদ্দার

Project Support
Abhijit Ghatak
Sankar Ghosh
Abhishek Mallik
Amit Podder

অক্ষর বিন্যাস ও অলংকরণ
মৌমি পাঁজা
তনুশ্রী গুহ

Page Layout and Illustration
Moumi Panja
Tanushree Guha

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, চিত্র ও রূপায়ণ
ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী
মৌমি পাঁজা
তনুশ্রী গুহ
অভিষেক মল্লিক

Cover planning, painting and design
Indrajit Chowdhury
Moumi Panja
Tanushree Guha
Abhishek Mallik

সম্পাদকীয়

পূজা ও প্রযুক্তির জগতে নতুন দিগন্ত

পৃথিবী বিচলিত। চারদিকে প্রাকৃতিক,সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে মা দুর্গার আসন্ন আগমন।
বিদেশের মাটিতে দূর্গাপুজোয় আকাশ, বাতাস উৎসব মুখরিত হয় না, শরতের বাঁশি শোনা যায়না। আমরা সাবেকি বাঙালিয়ানার উচ্ছাসে তিন দিন ব্যাপী এক জগৎ রচনা করি, দেশ বিদেশ একাকার হয়ে পুজোর এক অনাবিল আনন্দে মাতি। প্রতি বছরের মতো, এক্সেকিউটিভ কমিটি, বহু পরিশ্রমে, যত্নে মহিষাসুরমর্দিনী মায়ের পুজোকে ঘিরে আয়োজন করেছে এক আনন্দযজ্ঞের । আসুন, আমরা সেই আনন্দে অবগাহন করি, কুড়িয়ে নিই কিছু ঐশর্য্য, মূল্যবান কিছু মুহূর্ত জমা পড়ুক স্মৃতির ঝুলিতে। তারপর মায়ের কাছে এক শান্তিপূর্ণ ও আলোকিত জগতের জন্যে প্রার্থনা করি, দশমীর ঢাকের বাজনায় ও বিসর্জনের মন্ত্রে মা কে বিদায় জানিয়ে প্রতীক্ষা করি আগামী বছরের জন্য।

ইতিমধ্যে মা দুর্গার আশীর্বাদের অগ্রিম আভাস আমরা পেয়েছি। ভারতবাসী আনন্দে উচ্ছসিত। অবশেষে
মুন ল্যান্ডিং ক্লাবে যোগ দিয়েছে ভারত। ISRO পরিচালিত চন্দ্রযান-3-এর সাফল্য শুরু মাত্র ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের পর ভারত এখন চতুর্থ দেশ যারা চন্দ্রে অবতরণ করেছে।
গত ২৩ শে আগস্ট চাঁদে ভারতের ঐতিহাসিক সফট-ল্যান্ডিং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নতুন দরজা খুলে দেয়, যা ভারতীয় জাতির কাছে বিশাল গৌরবের বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এআই-চালিত সেন্সরগুলি চন্দ্র পৃষ্ঠে ল্যান্ডারের টাচডাউন সুরক্ষিত করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রযুক্তিটি দক্ষতার সাথে নেভিগেট করতে, ঝুঁকি কমাতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে।
শুধু তাই নয়, চন্দ্রে সফল অবতরণের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে, সূর্য্য অধ্যয়নের প্রথম মহাকাশযান আদিত্য-এল ১ অভিযান শুরু করেছে। আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং সকল মহাকাশ বিজ্ঞানীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত এখন উজ্জ্বল । বর্তমানে, জেনেরেটিভ এআই এর সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সমাজের একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। জেনেরেটিভ এআই, সোশ্যাল মিডিয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। বিশ্ব তোলপাড় করা এই প্রযুক্তি-টির রেনেসাঁর মাধ্যমে আমরা একটি অসাধারণ সময়ে রয়েছি, যা আমাদের জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপরিসীম ও প্রায়-জাদুগরি ক্ষমতায় আমরা বিস্মিত ও হতবাক। কিন্তু এই প্রযুক্তি-টি এখনো অসম্পূর্ণ।

পরবর্তী প্রজন্মের সম্পাদকদের উৎসাহে এই শক্তিশালী বিষয়টি প্রতিফলন করার তাগিদে প্রতীচী পত্রিকার প্রচ্ছদের চিত্রটি এবার এ-আই সহায়তায় সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য একাধিক এ-আই ইঞ্জিনের মাধ্যমে কম্পিউটার কুশীলব সম্পাদকেরা বহু সময় ব্যয় করেও বাংলার দশভুজা মা দুর্গার ছবি নিখুঁত ভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি।
এর মানে এই নয় যে এ-আই কখনোই নিখুঁত হবেনা। এ-আই ব্যর্থ হয় তিনটি মূল কারণে; পক্ষপাত, দুর্বল ডেটা এবং প্রত্যাশা ।

যদিও এ আই সৃষ্ট মা দুর্গার চিত্রটি প্রথাগত বা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত হয়নি, আমরা এ-আই বিবর্তনের, এখনও অপূর্ণ পর্যায় দেখানোর জন্য সেই চিত্র-টিই প্রচ্ছদে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্যদিকে শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী-র তুলিতে আঁকা মায়ের দুটি অপূর্ব, প্রথাগত ছবি পত্রিকার মধ্যে অন্তর্গত করা হয়েছে। ভালো মন্দ বিচারের দায়িত্ব পালন পাঠক এবং পাঠিকারা করবেন ।

অদূর ভবিষ্যতে, দশভুজা মায়ের চিত্রের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা বৃদ্ধি হলে পক্ষপাতশূন্য, শক্তিশালী ডেটার সাহায্যে মায়ের অতি মনোরম এবং প্রত্যাশিত চিত্র অবশ্যই সৃষ্টি করা যাবে। তবে, জেনেরেটিভ এআই-এর সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পাদকীয়

জেনেরেটিভ এ-আই দীর্ঘমেয়াদে কী করতে পারে এবং কী করবে, এই বিষয়ে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মতামত রাখেন। ভাবপ্রবণ বিশেষজ্ঞরা সুদূর ভবিষ্যতে শক্তিশালী এ-আই এর দাপটে মানব জাতির বিলুপ্ত হবার আশংকায় বিচলিত হন আবার কিছু বাস্তববাদী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বিবর্তনের ধারা বহন করে এ-আই সৃষ্ট অতিমানবের রাজ্যে অবশ্যই মানব জাতির বিলুপ্তি ঘটবে। সেই সম্ভাবনা অত্যন্ত বিষাদের কিন্তু আমার কল্পনায় বিশাল ছায়াপথে কোনো একটি গ্রহে হাসি, কান্না ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে আরেকটি মানব জাতি, আরেকটি পৃথিবী নিশ্চয়ই সৃষ্টি হবে। সেখানে আরেক কবির কণ্ঠে ভেসে আসবে

"আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি , পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান"

এই বছর প্রবীণ এবং নতুন প্রজন্মের সম্পাদকদের মিলিত দলটি খুবই সৃজনশীল এবং উদ্যোগী। তাদের অক্লান্ত ও বিশদ পরিশ্রমে এই পত্রিকাটি তৈরি হয়েছে, আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে।

অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্যের জন্য পত্রিকার পক্ষ থেকে এক্সেকিউটিভ কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই।
সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের জন্য শারদীয়া অভিনন্দন রইলো ।

নীতা বোস



President's Message

Dear BAGA Family,

Please join us in celebrating Durga Puja in the Bengali Association of Greater Atlanta's 44th year.

Durga Puja is a time of great significance in our culture and tradition. It symbolizes the victory of good over evil, the triumph of courage over fear, and the power of unity and devotion. This is a time when we come together as a community, celebrating our shared heritage and values.

It has been a great honor and an immense privilege for me and the entire Executive Team for this opportunity to serve the community this year. After two long pandemic-plagued years, this time we were successful in conducting all our programs live for the community. This would not have been possible without our members and sponsors. I want to express my heartfelt gratitude to each one of you for your unwavering support and dedication to our organization. Your commitment and involvement are the pillars that uphold our traditions and strengthen our community bonds.

Every year we face unique challenges, some of which are under our control, and some are not. However, the strength of our community comes from learning from these challenges, improvising, and rebuilding. Over these four decades, BAGA has stood strong in all tests and grown by leaps and bounds. As the roots go deeper, the branches multiply and flourish. BAGA Sports has taken up a leadership role in the community and has led by example, conducting multiple successful sporting events. The BAGA Youth Committee has been instrumental in guiding our younger generation, preparing them to take up meaningful roles and to be responsible adults, which is commendable.

During my tenure as the President of the Executive Team, I have come across an immensely talented and humble team of individuals. It was a true blessing to work beside them. I would like to personally thank Amit, Akashlina, Abhishek, Devi, Sankar da, Hironmoy, and Sumanta along with their families for their wholehearted dedication to the cause of unifying the community and successfully organizing our events. I would also like to take a moment to thank the Board of Directors for their support and guidance. A big round of applause to all the volunteers and members who have worked selflessly to collect and put together the means to support the organization and conduct various BAGA events.

Let us all take this opportunity to reflect on the lessons of Durga Puja—the strength that comes from unity, the importance of faith and determination, and the need to support one another through thick and thin. As we offer our prayers to Goddess Durga, may she bless us all with health, happiness, and prosperity.
Once again, I extend my warmest Durga Puja wishes to you and your families. May this festive season bring joy, peace, and prosperity to all.

Best Wishes,
Abhijit Ghatak

Executive Committee



Abhijit Ghatak, his wife- Deblina Chatterjee, and kids Avamon Ghatak and Rishani Ghatak have been a resident of Atlanta since 2019. Abhijit is an Interventional Cardiologist who has served the Atlanta suburb community as a doctor for the last 5 years. It was a great honor and privilege for Abhijit to serve the BAGA community for the year 2023 as the President of the Executive Committee. He likes to spend time away from work with his family and is deeply involved in his kid's activities.



Amit Podder is a sports enthusiast and an active member of BAGA. Amit derives immense pleasure from culinary arts. Within EC, Amit took the responsibilities of managing logistics, food-related matters, and spearheading fundraising efforts. Amit lives in the Smyrna neighborhood with his beloved wife Arpita and their daughter Tanisha.



Devi Banerjee has been a member of BAGA for a long time. She has been living in Atlanta since 2006. She has been involved in the teaching profession. This year Devi feels privileged to serve in the Executive Committee. Best wishes to all BAGA members.



Hironmoy Das, a sports enthusiast passionate about soccer and cricket, is also a fitness lover, especially swimming. His culinary skills bring joy, and he stays updated on global affairs. An active BAGA member since 2018, he's a business solution architect in Atlanta, residing in Marietta with his wife, Sanyo, and two beloved dogs, Simba and Copper.



Abhishek Mallik is a true kolkata boy. He was born and brought up at north kolkata,. Abhishek moved to US, Atlanta in Aug 2021 with his wife Tanushree Guha and daughter Aaleyah. With his passion in the field of computation and AI, professionally, he leads multi-million business lines for an IT service company.



Akashlina Sayed is a resident of Atlanta since 2013. Comes from a literary family, a accomplished singer and theater enthusiast, who is actively involved with many artistic communities, taking on multiple roles and contributing to the growth of arts in the greater Atlanta area. A software engineer by profession. This year Akashlina feels privileged to serve as BAGA EC and lead the culture activities.



Sankar Ghosh along with wife Ruby moved to Atlanta in 2017 and became member of BAGA since 2018. They are currently staying in Cumming, GA. They are happy being part of BAGA and lucky to have many friends of the Community. Greeting and Best wishes from Sankar Ghosh & Family on Occasion of Durga Puja 2023 .

Board of Directors

We humbly seek the blessings of Maa Durga, praying that she showers us all with abundant joy, tranquility, and prosperity. We cordially invite you and your family to join us in this year's eagerly anticipated Durga Puja. We are confident you will enjoy the festive atmosphere and unique essence of the BAGA Durga Puja.

Our organization has continued its growth in size and vibrancy and remained a welcoming haven for the Bengali diaspora and others. This significant role owes much to the commendable efforts of the Executive Committee (EC), the BAGA Sports Club (BSC), and the BAGA Youth Club (BYC), as well as the unwavering dedication of our numerous volunteers. Embracing this progress and future vision, in 2022, the Board embarked on groundbreaking digital initiatives for BAGA. In 2023, the Board is diligently working to finalize these endeavors and update our longstanding Constitution to meet the needs of our rapidly expanding organization.

Our collective success hinges on our collaborative efforts. We remain deeply grateful to all BAGA members, donors, sponsors, and volunteers. Once again, we would like to express our deep appreciation to each of you for affording us the privilege of serving you. We extend warm wishes for a joyous Durga Puja and Subha Bijoya to all.

At your services,
BAGA Board of Directors

Mr. Dharmajyoti Bhaumik
Chairperson



Mr. Raja-Gautam Kar
Secretary, Chair Pro Tem,
Election Officer



Mrs. Sarbani Samadder
Treasurer, Election Officer



Mrs. Sukla Mondal
Director



Mrs. Debasree Roy
Director, Election Officer



Sports Committee

At the heart of Baga Sports Committee's (BSC's) ethos lies a commitment to sports that transcends mere competition. It encapsulates the exhilaration of the game, the camaraderie it fosters, and the unadulterated joy it brings. it's not just about playing games; it's about the thrill, the camaraderie, and the sheer joy of it all.

2023 Baga Badminton and TT Tournament

The sports frenzy began this year with the Badminton and TT tournament, held on February 25th at the Atlanta Badminton Center. More than 50 players, young and old, men and women, stepped onto the court and the TT table, ready to give it their all.

The atmosphere was electric, with friends and family members shouting. It felt like a sports carnival right in the heart of Atlanta.

Team Asit emerged as the Badminton champions, while Team Kamal won the TT tournament.

2023 Baga Cricket Tournament

After the TT tournament, BSC organized the most awaited sports event in Baga, the Cricket Tournament. This epic showdown occurred over two action-packed weekends, May 6th and 13th. Four franchise teams battled it out, each game hotly contested with throngs of supporters showing up to back their favorite teams.

There was a 2-way tie to determine the finalist. Calculators came out with each data point, such as run rate, victory margin, etc., fed into it to determine one of the finalists.

The finals drew a tremendous amount of excitement, and it reached its peak as Team Super Strikers, led by Dipanjan emerged as the ultimate champions.

2023 Baga Soccer Tournament

After the cricket tournament and as August came along, it was time for Soccer. For the first time, the Baga soccer tournament was held under lights in the newly built Cauley Creek Park on August 12th.

The franchise concept was also introduced in Soccer. 4 teams were formed, and an innovative auction approach was introduced to select the four teams. Again it was another day of extreme fun and enjoyment, with four teams playing through heavy rain, heat, and humidity.

Team Rockbaaj Gladiators, led by Hiron, were the champions.

Introducing Sports to the Youth of Baga

BSC decided to put the spotlight on our young sports stars. They encouraged kids to participate by making it completely free to join the sports action. Both cricket and soccer had dedicated kids' tournaments, and the response from the young champs was nothing short of spectacular.

Sports Committee

Enthusiastic and energetic, the kids showcased their skills, determination, and love for the game. It was a sight to behold as these budding athletes stole the show with their passion and sportsmanship.

As we look ahead, BSC is working to ramp up the sports enthusiasm in Baga and make it inclusive. One thing is for sure - whether it's rain, heat, or humidity, whether we win or lose, the fun, the joy, and the thrill of sports in Baga will never stop. Here in Baga, the sports party is just getting started!

BAGA Sports Committee



Romeo Laskar
(President)



Jaydip Das
(Treasurer)



Avijit Saha
(Vice President)











Youth Committee

The BAGA Youth Committee (BYC), is the youth organization of BAGA. The group consists of dedicated youth with a passion for helping the community throughout the year, building long-term friendships, and exploring and preserving their roots and heritage. The BYC is actively involved in different activities, such as fundraising, performing clothes/book drives, organizing community events (e.g. health fairs, blood drives, soup kitchens, etc.), and donating to charitable organizations. Committee members also assist BAGA with Puja decoration and other cultural and sport activities. The BYC's main goal is to develop social awareness for the youth community by extending the program to middle and high schoolers, as well as creating close bonding among the community members.



Rohini Roy
(President)



Aarushi Guin
(President)



Anushka Chowdhury
(Vice President)



Deetya Roy
(Vice President)



Ahana Singh
(Secretary - Cultural)



Divija Nath
(Secretary - Fund Raising)



Susmita Dhar
(Treasurer)



Saptanshu Maji
(Secretary - Sports)



Sukanya Sharma
(Secretary - Social Media)



Tanvi Nelakosigi
(Treasurer)



Tushar Chatterjee
(Volunteer)



Om Guin
(Volunteer)



Arjun Chakraborty
(Volunteer)



Rishabh Sharma
(Volunteer)



Sreyash Roy
(Volunteer)



Projusha Banerjee
(Volunteer)



Sruthi Bandyopadhyay
(Volunteer)





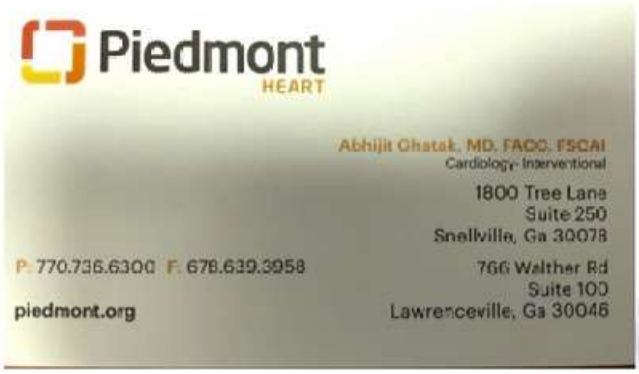




Abhijit Ghatak MD, MRCP (UK), RPVI, FACC, FSCAI.

Cardiologist/ Interventional Cardiologist @ Piedmont Heart Institute.

Featured in the "**Georgia Top Cardiologist**" in 2021 and 2022





Procedure and Services:

1. General and Interventional cardiology consultation.
2. Diagnostic heart catheterization.
3. Cardiac stent procedure.
4. Nuclear Stress test.
5. Echocardiography.
6. Peripheral vascular diagnostic Imaging.
7. Peripheral stent procedure.
8. Permanent pacemaker implantation.
9. Transoesophageal echocardiography.
10. Loop recorder and arrhythmia management.

American Board Certified
1. Cardiovascular disease
2. Interventional Cardiology
3. Echocardiography
4. Nuclear cardiology
5. Vascular Medicine

Offices: 766 Walter Road, Suite 100, Lawrenceville, GA,30046
1800 Tree Lane, Suite 250, Snellville, GA,30078.

Hospitals: Piedmont Eastside Medical Center
Northside Gwinnett Medical Center.

Appointment: Phone: **7707366300**
Online appointment:
https://www.care.piedmont.org/provider/Abhijit+Ghatak/2190322.

Same-day appointments are available.

PATEL BROTHERS
"Celebrating Our Food....Our Culture"

PATEL BROTHERS

BEST TASTE ®
SWAD
IN TOWN

সোনার বালা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়



এ ব্লেড হ্যাজ ফোর সাইডস। তিন দিন মোটে কামিয়েছে। তার মানে একটা দিক এখনো অব্যবহৃত। কিন্তু, কোন দিকটা? রোজই মনে রাখার চেষ্টা করে। রোজই ভুলে যায়। সামান্য একটা হিসেব। এক, দুই, তিন, চার। তাও খেয়াল থাকে না। কি যে তোর মাথা বঙ্কু। সকাল ন'টার সাইরেন অনেকক্ষণ বেজে গেছে। সাত মাইল দূরে অফিস। অনেক বাধা ঠেলে সাড়ে দশটার মধ্যে যেমন করেই হোক পৌঁছোতে হবে। এদিকে চারটে আসল কাজ বাকি। ক্ষৌরী খাজানা, নাহানা খানা পরনা। প্রথম কাজটাই আটকে গেছে। ব্লেডের হিসেব গোলমাল করে ফেলেছে।

সকাল থেকেই আজ সব ট্রেন লেটে চলেছে। গতকাল বঙ্কিমের এক সম্বন্ধির বিয়ে ছিল। বিয়ে হয়েই ছিল। গতকাল গেছে বউ-ভাত। এক পেট আবর্জনা নিয়ে শুতে শুতেই একটা বেজেছে। সারা রাত প্রায় ঘুম নেই। জঠরে বিভিন্ন সুখাদ্যের লাঠালাঠি। পরিপাক যন্ত্রের নির্দেশ কেউই মানতে চাইছে না। আটখণ্ড মাছ জোড়া লেগে কালবৌস হয়ে এ পাশ থেকে ওপাশ খেলে খেলে বেড়াতে চাইছে। কয়েক টুকরো মাংস বিগত জীবনের শোক ভুলতে পারছে না। মাঝে মাঝে ব্যা ব্যা করে উঠছে। ফ্রায়েড রাইস সমেত স্নেহ বস্তু ত্যাগ করে ফ্লুইড পলিউশানের দায়ে এক কোণে আলো চাল মেরে বসে আছে। এই হট্টগোলে দধি বেচারা পশু চর্বির ভার মুক্ত করে সমস্যা আরো সাংঘাতিক করে তুলেছে। গোটা কতক কমলা ভোগ ক্রিকেট বলের মতো কেবলই বোল্ড আউট করার চেষ্টা করছে। পাকযন্ত্র হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আমি হলুম গিয়ে ঝোলভাতের যন্ত্র, তুমি ঠুসছো মোগলাই খানা। আই হ্যাভ নো রেসপনসিবিলিটি, তোমার মাল তুমি বুঝে নাও। মাঝ রাতে বিনিদ্র বঙ্কিম জোয়ানের আরক খেতে খেতে সার বুঝেছে, অনুরোধে হয়তো ঢেঁকি গেলা যায় কিন্তু হজম করা যায় না। আর একটা জিনিস বুঝেছে, আড়াইশো টাকা এখনো এই বাজারেও খেয়ে উসুল করা যায়

না। কড়কড়ে টু হাণ্ড্রেড এন্ড ফিফটি রুপিজ। সামান্য একটি সোনার বালা। নতুন বউয়ের গোল গোল শ্যামলা হাতে মানিয়েছে জবর। ও মা দেখি দেখি বড় জামাই কি দিয়েছে? বাঃ বেশ দিয়েছে। মেয়ে মহলের প্রশংসায় বঙ্কিমের বুক দশ হাত না হলেও বঙ্কিমের স্ত্রী প্রতিমার চলার ঠমক খুলেছে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে কি দেমাক! জ্যালজেলে শাড়ি নয়, অপাঠ্য বই নয়, ডিফেকটিভ টেবিল ল্যাম্প নয়, প্ল্যাস্টার অফ প্যারিসের বিদ্‌ঘুটে কোন মূর্তি নয়, আস্ত একটা সোনার বালা ঝেড়ে সব শালাকে কুপোকাত করে দিয়েছে। অবশ্য এই বালা নিয়ে তার আগে বঙ্কিমের সঙ্গে অনেক চুলোচালি হয়ে গেছে। তিন রাত দুজনে এক ঘরে ঘুমোয়নি। দুদিন নির্জলা উপবাস। সাতদিন কথা বন্ধ। বঙ্কিম বলার মধ্যে বলেছিল, একটা দুটো শালা শালী হলে লোকে দামি কিছু দেবার কথা ভাবতে পারে। মা ষষ্ঠীর কৃপায় সংখ্যা তো নেহাত কম নয়। আগের তিন শ্যালক আর এক শ্যালীকাকে সাড়ে তিন পয়সা সোনার কানের ঠিকরে দুল দিয়ে জামাইকৃত্য করেছে, তখন সোনার দাম কম ছিল, নিজের সংসার ছোট ছিল। এখন দুটোই বেড়েছে। অতএব বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া আরো দুজন লাইন দিয়ে আছে। বছর না ঘুরতেই টোপোর পরার জন্যে মুখিয়ে আছে। এদিকে শালাজরা একটি করে আন্ডা পাড়ছেন আর অন্নপ্রাশনের স্টেনলেস স্টিলের থালাবাটি কিনতে কিনতে বঙ্কিম ক্রমশই বোম মেরে যাচ্ছে। কাকে সামলাবে! বড়র মেয়ে হল, তো মেজ একটি ছেলে দিলেন। অমনি বড় কোমর বেঁধে লাগলেন ছেলের জন্যে। মেজ টেক্কা দিয়ে যাবে সহ্য হবে কেন? রেজাল্ট। আবার মেয়ে। এদিকে সেজ সকলকে টেক্কা দিয়ে একসঙ্গে দুটি ছাড়লেন। প্রবল প্রতিযোগিতা। ঘরদোর বাড়ি উঠোন নবজাতকে ছয়লাপ।
অনবরতই চ্যাঁ ভ্যাঁ।

বঙ্কিম বলতে চেয়েছিল, সোনার এখন প্রচণ্ড দাম, একটা ভালো শাড়ি দিয়ে ছেড়ে দাও। তা কি করে হয়? এই ভাই আমার সবচে আদরের ভাই। ট্যাঁকে করে মানুষ করেছি। একটা ভারী কিছু না দিলে প্রেসটিজ থাকে না। আরে ম্যান তুমি এত রোজগার করছ? বিয়েতো একবারই করে লোকে। এর পরের কাজ তো অনেক পরে। বঙ্কিম খুঁত খুঁত করে বলেছিল, তাহলে সেই পেটেন্ট দুল। তিন পয়সার সোনা। না না দুল নয়, দুল নয়। প্রতিমার ঘোরতর আপত্তি। দুল একঘেয়ে হয়ে গেছে। প্রতি কাজেই দুল গেছে। এবার অন্য কিছু।

'অন্য কিছুটা কি? হীরের আংটি!' বঙ্কিম খিঁচিয়ে উঠেছিল।



'হীরের আংটি দেবার মুরোদ আছে তোমার?' প্রতিমা একটু মোচোড় মেরে ছিল।

'কেন নেই! তুমি চাইলেই আছে। বাড়িটা বেচে দিয়ে তোমার পেয়ারের ভাইয়ের বউয়ের আঙুলে হীরের আংটি তুলে দি।' বঙ্কিম ইস্যুটাকে আর একটু ঘোরালো করে তুলল; আমার বিয়েতে তোমার বাপের বাড়ি থেকে যা দিয়েছিল সবই তো প্রায় উশুল করে নিয়েছ আর গোটা বত্রিশ টাকা হয়তো পাওনা আছে।

এরপর প্রতিমা আর কথা বাড়ায়নি। মুখ তোলো হাঁড়ি করে সংসারের কাজে লেগেছিল। বঙ্কিমও বিশেষ আমল দিতে চায়নি। তোমরা সব বিয়ে করে, খাট, বালিশ, বিছানা, ফার্নিচারে বাড়ি ঠেসে ফেললে। মোটা মোটা বউ। মোটা মোটা নগদ। ভালো ভালো তত্ত্ব। টেরিলিন, টেরিকটন, ঝকঝকে জুতো, চেহারা। এদিকে বঙ্কিম বেচারার হাঁড়ির হাল। তার বেলায় এক কাঁদুনি, কে করবে।

শ্বশুরমশাই গত হয়েছেন। তিনি থাকলে সবই হতো। ছেলেরা যে যার সে তার। না করলে জোর তো করা যায় না। প্রতিমার যুক্তি, তুমি ভিখিরি না কি? তুমি আমার রাজা।' পরের ধনে পোদ্দারি করবে কেন? নিজের রোজগারে লড়ে যাও ম্যান। খুব হিসেব হয়েছে। ব্লেডের যে কোনো এক দিক ক্ষুরে চাপাও। গালে পড়লেই ধার বোঝা যাবে। বঙ্কিম আর হিসেবের ঝামেলায় যেতে চাইল না। কোন হিসেবটা সে শেষ পর্যন্ত রাখতে পেরেছে। মধ্য মাসেই মাইনের টাকা ফৌত। বাকি কটা দিন, এটা ধরে টান, ওটা ধরে টান। তখন সে খেচর, ভূচর জলচর। দাড়িতে একটা টান মেরেই বঙ্কিমের মালুম হল ব্লেডের হিসেব মেলেনি। হেঁ হেঁ বাবা, অতই সোজা! এক চান্সে মিলে যাবে! জীবনে মেলেনি। আজ মিলবে! ছাত্রজীবনে একদিনের জন্যেও হাজার চেষ্টা করে 'সরল কর'র উত্তর শূন্য কিম্বা এক হয়নি। সব সময় একটা বিদ্‌ঘুটে ভগ্নাংশ পূর্ণ-ফূর্ণ নিয়ে তলায় এসে থিতোতো। দেখলেই চক্ষু স্থির। বঙ্কিমের শিক্ষকরা বলতেন, ছোকরার এলেম আছে। কোথা দিয়ে যে কি করে বসল। উত্তর দেখেছ একপূর্ণ দুশো তেত্রিশের ন'হাজার তিন। বলিহারি বাবা।' শেষে বঙ্কিমের এক বন্ধু পথ বাতলে দিলে। ট্রাই ইওর লাক। হয় শূন্যে, না হয় এক। এক কাজ করবি। ধর, দুশো বত্রিশের পাঁচশো তের হয়েছে। ঘাবড়াও মাত। পাঁচশো তেরর দুশো বত্রিশ দিয়ে গুণ করে দে। ইজিকোয়ালটু ওয়ান। উত্তর যদি শূন্য না হয় ফুলমার্ক'। আর যদি শূন্য করতে চাও যা হয়েছে সেই সংখ্যাটাই মাইনাস করে দাও। শূন্য কি এক? এক কি শূন্য? এইটা ঠিক করার মধ্যেই একটু ফাটকাবাজি রয়ে গেল। ওটুকু রিস্ক তোমায় নিতেই হবে। নো রিস্ক নো গেন।

ব্লেডটাকে আবার উল্টে লাগাতে লাগাতে বঙ্কিম ভাবলে রিসকটাই নিলুম সারা জীবন গেনটা ছাই হল কি! শূন্য আর একের ঘোরপ্যাঁচে পড়ে ফুলমার্ক আর ভাগ্যে জুটল না। গালের সাবান শুকিয়ে খুসকির মতো উড়তে শুরু করেছে। অন্যদিন আটটার মধ্যেই দ্বিতীয় পক্ষের চা এসে যায়। আজ প্রায় সাড়ে ন'টা বাজতে চলেছে। সম্বন্ধীয় বিয়েতে বঙ্কিমের বাড়ির অবস্থা দেখলে মনে হচ্ছে মড়ক লেগেছে। সব কিছুই এলোমেলো। দেরিতে সব ঘুম থেকে উঠেছে। ঘরে ঘরে দোমড়ানো চটকানো বিছানা। প্রতিমার নীলাম্বরী আলনায় জড়ভট্টি। ব্লাউজ মাটিতে লুটোচ্ছে। উঁচু গোড়ালির জুতো যথাস্থানে নেই। সকালের শুঁড়িখানার মতো লণ্ডভণ্ড অবস্থা। শরীর যখন নিচ্ছে না বিয়ে বাড়িতে নাচতে কুঁদতে যাওয়া কেন? সকালে একবারই প্রতিমাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বাসী নায়িকার মতো চেহারা। চোখে অস্পষ্ট কাজল। মুখের এখানে ওখানে প্রাচীন দেয়ালের মতো চটা উঠা মেকআপ। পরিপাটি খোঁপা যেন থ্যাতলানো গোলাপের কুঁড়ি। উৎসব ভোরের বউকে যে এত অশ্লীল দেখায়, বঙ্কিমের ধারণা ছিল না। ঠোঁটে আবার ফাটা ফাটা পানের রসের ছোপ। লাখ টাকা দিলেও ও ঠোঁট চুম্বনের অযোগ্য।

জুলপির কাছে ব্লেডের কোপ বসিয়ে বঙ্কিম নিজেকেই বললে, 'চায়ের সেকেন্ড এডিশানের আশা ছাড়ো মানিক। সকাল থেকেই তো দফায় দফায় ইন্টারভিউ। প্রতিবেশীদের, ভায়ের বউভাতের ফিরিস্তি দেবে না, চা তৈরির মতো একটা তুচ্ছ কাজে সময় নষ্ট করবে। ওঃ, খুব করেছে ভাই এই বাজারে! মাছ? এই চাকা চাকা দাগা। যত পারো খাও। এক হাজার কমলাভোগ এখনো ভাঁড়ারে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সাত হাঁড়ি দই, হাত পড়েনি। হিসেব নেই তো! সব ভাইয়ের দিলই তো হাওদাখানা!

তোমার মুখেই শুনলুম হাওদাখানা। বঙ্কুবাবুর বেলাতেই যত কৃপণতা। জামাই ষষ্ঠীতে একবারই তোমার কোনো এক দিলদার ভাই একটা দিশি কাপড় কিনেছিল। কেনার সময় মনেই ছিল না বড় জামাই প্রমাণ সাইজের একটা লোক। কিনে নিয়ে এল একটা খোকা কাপড়। বহর বোধহয় আটত্রিশ ইঞ্চি, লম্বা আট—বড় জোর ন-হাত। বেহিসেবি ঠিকই। তবে জামাইদের ব্যাপারে অলওয়েজ অন দি মাইনাস সাইড। তবু প্রতিমা ভায়েদের ডিফেন্ড করে গেল। খাটো ঝুলই তো ভালো গো। কত কনসিডারেট। পাছে বোন বিধবা হয় সেই ভয়ে ছোট কাপড় দিয়েছে। বাসে ট্রামে ওঠার সময় অসাবধানে পায়ে জড়িয়ে যাবার নো চান্স। একেই

বলে সেফটি ধুতি। বঙ্কিম বলেছিল, রোড সেফটি উইকে পরে বি-বা-দী বাগে সাদা দাগের ওপর দিয়ে হেলেদুলে রাস্তা পার হব, কি বল?

দাড়িতে ব্লেডেতে যখন কিছুতেই বনিবনা হচ্ছে না, প্রতিমা তখন দুধের সর ভাসা এক কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করল। মেঝেতে খেবড়ে বসে বঙ্কিম দাড়ি মুক্ত হবার চেষ্টা করছিল।

'ধরো ধরো।'

'রাখো না!'

নিচু হবার কষ্টটা ও-মহিলা-স্বীকার করতে চায় না। পারলে বঙ্কিমের চাঁদিতেই কাপটা বসিয়ে দিয়ে যায়! এমন কিছু ভুঁড়ি নেই। বয়সও তত নয় যে কোমরে আর্থাইটিস হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। হাপরের মতো একটা শব্দ করে প্রতিমা জলভর্তি প্ল্যাস্টিকের মগের পাশে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু চা ছলকে ডিশে পড়ল। বঙ্কিম একবার আড়চোখে তাকাল।



চায়ের কাপ, জলের মগ, দাড়ি কামাবার বুরুশ। সেভিং ক্রিমের টিউব, চাকা, কৌটো, সেফটি রেজারের খাপ, ছোটো তোয়ালে, ব্লেডের কাগজ, ফুটখানেক দূরে প্রতিমার ফুলো ফুলো পা। সায়ার ফ্রিল। পায়ের পাতায় জলের ছিটে। প্রতিমা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে, 'তুমি বেরোবে নাকি?'

'হুঁম।'

'নাই বা বেরোলে আজ!'

'অফিসটা আমার মামার বাড়ি নয়।' গলার নিচে থেকে ওপর দিকে ব্লেড চালাতে চালাতে সংক্ষিপ্ত উত্তরে বঙ্কিম তার মনের ভাব জানিয়ে দিলে।

'মামার বাড়ি নয় সে আমিও জানি। এমনি হাজার দিন কামাই করছ। আজকে যেতে হবে না। এই বলছিলে হজম হয়নি, রাতে ঘুম হয়নি। চানটান করে একটু শুয়ে পড়।

হজম হয়নি বলে চাকরিটা তো আর হজম করতে পারি না। চাকরি চাকরি-ই। এরপর একবারেই শুইয়ে দেবে। তখন সংসার সামলাবে কে? তুমি না তোমার ভায়েরা?'

'ভায়েরা কোন দুঃখে সামলাবে! তাদের সংসার নেই!' তোমার সংসার তুমি সামলাবে।'

'তবে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না দয়া করে।'

'সকাল থেকেই বাবুর মেজাজ একেবারে সপ্তমে। বাপ বললে শালা বলতে আসছে।'

'হ্যাঁ আসছে। যার ছত্রিশটা শালা তার গলা দিয়ে অষ্টপ্রহর হরিনামের মতো পালা শালাই বেরোবে।' বঙ্কিম উত্তেজনায় সাবান মাখা বুরুশটা জলের মগের বদলে চায়ের কাপেই ডুবিয়ে দিলে। 'যাঃ শালা। চা-টাই গেল। সেই ফুলপড়ার মতো টাঙিয়ে থেকে থেকে যদিও এক কাপ ছ্যাকরা চা জুটলো, কানের কাছে তোমার বকবকানির চোটে তাও গেল।'

'আমি আর করে দিতে পারব না। খেতে হয় ওই চা-ই খাবে না হয় ফেলে দেবে।'

'সে আমি জানি। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজী। যতদিন বালাটা আদায়ের প্রয়োজন ছিল, ততদিন না চাইতেই চা, না চাইতেই জল। কাল সন্ধ্যে থেকেই তোমার অন্যমূর্তি। সব শালাকেই আমার চেনা আছে শালা। চায়ের ভয় দেখিও না। দোকান আছে, পয়সা ফেলব কাপ কাপ চা খাবো, মিনিটে মিনিটে খাব। তোমার পরোয়া করি!'

'কে কার পরোয়া করে। আজকাল কেউ কারুর পরোয়া করে না বুঝলে দোস্ত। দোকানে শুধু চাই জুটবে অন্য কিছু জুটবে না?'

'সব জুটবে, সব জুটবে। পয়সা ফেললে সব জুটবে। মাসে একটা করে সোনার বালা ছাড়লে

আরও অনেক কিছু জুটবে, বুঝেছ? মোনোপলির যুগ শেষ হয়ে গেছে।'

'তাই জোটাও! জুটিয়ে যে রাখনি তাই বা কে জানছে! তোমার প্রাইভেট লাইফের খবর কতটুকু জানি? অফিস অফিস করে কেন এত পাগল? বুঝি না ভাবো? কাজ তো যা কর জানাই আছে! তুমি একদিন না গেলে অফিস একবারে উল্টে যাবে না? ওই কাঁধকাটা, পেট-কাটা, পিঠ-কাটা মেয়েছেলের ধান্দা! সারা দিন বিনা পয়সার ফষ্টিনষ্টি!'

'হ্যাঁ, অফিসটাতো কুঞ্জবন, সেখানে সব রাধিকারা সেজেগুজে এই বুড়ো কেষ্টর জন্যে কদমতলায় বসে আছে। মোস্ট লাইবেলাস রিমার্ক। কোর্টে মানহানির মামলা ঠুকে দেওয়া যায়।'

'বুড়ো কেষ্টদেরই তো সবচেয়ে বেশি ভয়। খাচ্ছ মাল। ডুবে ডুবে জল খায় শিবের বাবাও টের পায় না।'

বঙ্কিম সেফটি রেজার থেকে গম্ভীর মুখে ব্লেড খুলতে খুলতে বললে, 'প্লিজ, প্লিজ, মেছুনীদের মতো তর্ক কোরো না। বালা হয়ে গেছে, এখন আর আমার সঙ্গে নো রিলেশান। আবার অন্নপ্রাশন আসছে। ভয় নেই, তখন সংসারের ডালে বসে আবার তোমার কোকিল কণ্ঠ শোনা যাবে। তোমাকে আমার স্টাডি করা হয়ে গেছে। স্বার্থপরতা ইনফিনিট।'

'বালা, বালা করে দেখছি পাগল হয়ে যাবে? ঠিক আছে আজই আমি নতুন বউয়ের হাত থেকে বালা খুলে এনে তোমার নাকের ডগায় ছুড়ে ফেলে দেব। কঞ্জুস কাঁহাকা।'

'মুখে সামলে। ডোন্ট ফরগেট, আই অ্যাম ইওর হাজব্যান্ড। গুরুজন। তুমি হিন্দু নারী। পতি পরমগুরু।'

'সে রকম পতি হলে গুরু বলে মান্য করা যায়। তোমার মতো পতির পত্নী হয়েছি এই তোমার সাত পুরুষের ভাগ্য।'

'তাই নাকি? বেশ বুলি ফুটেছে তো। আর যে বাড়ির মেয়ে, কথাবার্তার এর থেকে ভালো ছিরি অবশ্য এক্সপেক্ট করা যায় না। মোস্ট আনসিভিলাইজড্ রুট।

'আমাকে বলছ বলো, খবরদার বাড়ি তুলবে না। বাড়ি তোলা মানেই বাপ তোলা। জেনেশুনেই তো বিয়ে করেছিলে। কে বলেছিল বিয়ে করতে, না করলেই পারতে।'

'তাই নাকি? মনে নেই, তোমার মা যখন হাতে ধরে কান্নাকাটি করেছিলেন, বাবা আমার মেয়েটাকে নাও, মেয়েটাকে নাও বড় ভালো মেয়ে, তোমাকে একটু ইয়েও করে।'

'মার বয়ে গেছে তোমার হাতে ধরতে, আমারও বয়ে গেছে তোমাকে ইয়ে করতে। কত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার ছিল। আচ্ছা আচ্ছা সব ছেলে ছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ জানা আছে। হাজার টাকায় ব্যারিস্টার জুটতো?'

'হাজার কেন, দরকার হলে বাবা পঞ্চাশ হাজার খরচ করতেন। টাকার অভাব ছিল না কি?'

'ও টাকার অভাব ছিল না? তাহলে আমার বেলায় দায়সারা করলেন কেন চাঁদু।'

'তোমার মতো বস্তুর জন্যে যে দাম দেওয়া উচিত তাই দিয়েছেন।' প্রতিমা শেষ তোপটা দেগে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফরফর করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সাবান গোলা এককাপ চা নিয়ে ক্রেস্টফলেন বঙ্কিম ছড়ানো দাড়ি কামাবার সামগ্রীর মধ্যে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। পেটে শ্বশুরবাড়ির বদহজমের মাল। মনে প্রতিমার খোঁচা। অস্পষ্ট দাড়ি খিচখিচ করছে। অন্যদিনের মতো ভেলভেট সফট হয়নি।

আয়নায় নিজের মুখের প্রতিফলন-এর দিকে বঙ্কিম ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। আয়নার মুখ যেন বলছে : হায় বঙ্কিম, কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র, সংসারোহমতীর বিচিত্র কস্য তং বা কৃত আয়ত। চোখের কোণে কালি পড়েছে বাপি, দৃষ্টি ক্রমশ সরে আসছে। আর কেন? জয় শিব শম্ভু, উখার দে মকান লাগা দে তাম্বু। চলো বেটা, গঙ্গা যমুনা তীর। আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিলে মানিক! ছিলে এক হয়েছ তিন। আর কিছু কাল পরে হবে চার, তার পর হয়তো পাঁচ। নিউমারিক্যালি তুমি বাড়তেই থাকবে। উত্তাপে বীজ তাড়াতাড়ি অংকুরিত হয়। এখনো সময় আছে, বি কেয়ারফুল ম্যান।

'কি ভাবে গুরু?' আসল বঙ্কিম প্রশ্ন করল প্রতিফলিত বঙ্কিমকে।

'তবে শোন একটা কাহিনি। বরাহ অবতাররূপী নারায়ণ হিরণাক্ষকে বধ করে নিজের স্বরূপ ভুলে গেলেন। কমপ্লিট ওবলিভিয়ান। ছানাপোনা নিয়ে সংসার পেতে বসলেন। এটাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। ওটার গা চেটে দিচ্ছেন। কেলেঙ্কারি কাণ্ড।



দেবতাদের মাথা ঘুরে গেল। হায় নারায়ণ। হিরুকে মারতে গিয়ে একি ফ্যাসাদ বাধালে প্রভু। ল্যাজারাস গোবেরাস অবস্থা। তুমি তো রিয়েল বরাহ নও। বরাহ হয়েছিলে ফর এ গ্রেট কজ। এ দেখছি প্লে বিকেম এ টাস্ক। উঠে এসো প্রভু। স্বর্গে তোমার সোনার পালংক, নারায়ণী সেজেগুজে সালংকারা। অপ্সরারা নৃত্যগীত করছে। আতর ছড়াচ্ছে। আর তুমি কিনা আস্তাকুঁড়ে ছানাপোনা নিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করছ। এ কি সাংঘাতিক আত্মবিস্মৃতি। বুড়ো বুড়ো দেবতাদের দিকে আঙুল তুলে নারায়ণী বললেন, দিস ইজ ফর ইউ। বয়োজ্যেষ্ঠ আপনারা। অনবরত একটানা একটা উপদ্রব তৈরি করে, আজ বরাহ, কাল নৃসিংহ, পরশু কূর্ম করে আমার ঘরসংসারের বারোটা বাজালেন। এবার সবটার মুখে নুড়ো জ্বেলে খেংরে বিষ ঝেড়ে দেবো। মাতাল, লম্পটের দল।'

দেবতাদের মুখ চুন। নারায়ণটার কি বুড়ো বয়েসে ভীমরতি হল। তুই দেবতা জন্ম ভুলে শূকর সেজে শূকরীর সঙ্গে সংসার পাতলি। ইডিয়েট!

শেষকালে দেবতাদের সভায় শেষ লগ্নে স্থির হল, নারদ কো বোলাও।

নারদ চোখ রগড়াতে রগড়াতে রাগ রাগ মুখে এসে ঢুকল। তার শরীরটা ভালো না।

দেবরাজ বললেন, 'নাড়ু নারায়ণকে যে সেভ করতে হবে। বেচারা মর্তে গিয়ে বেহেড হয়ে গেছে।'

নারদ বলল, 'আমি স্যার এখন মর্তে যেতে পারব না, আমার শরীর খারাপ।'

দেবরাজ বললেন, 'তোমাকে যে একবার বরাহরূপী নারায়ণের কাছে যেতে হচ্ছে।'

এই ভয়টাই নারদ করেছিল। কিন্তু, কী আর করা দেবরাজের হুকুম। শেষে নারদ ঢেঁকিতে করে বরাহ অবতারের কাছে গিয়ে ল্যান্ড করেন।

বললেন, 'এই যে গুরু, মেমোরিটা একবারে গুলে খেয়ে বসে আছ যে। এটা তো তোমার আসল রূপ নয়।'

বরাহ প্রথমে অ্যাটাক করতে এল। নারদ প্রস্তুত ছিল। 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে বার কতক খোঁচাখুচি করতেই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বেরিয়ে এলেন। নারদকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দোস্ত মাই সেভিয়ার। কিন্তু মন্দ ছিলুম না হে। আহার নিদ্রা বেড়ে লাগছিল। বাট পাস্ট ইজ পাস্ট। চলো কেটে পড়ি।'

আয়নার বঙ্কিমকে বঙ্কিম বললেন, 'ধান ভানতে শিবের গীত গাইলেন কেন? হোয়াট ইজ দি মিনিং? তুমি বলতে চাইছ, পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ কাঁদে তাইতো?'

'এগজ্যাকটলি?'

তা মাঝখানে ওইসব ভ্যানতারা করার কি দরকার ছিল? ছোট্ট দুলাইনের স্টোরি উইথ এ বোলড সারমন। নিজের আসল সত্ত্বাটাকে হারিয়ে ফেলো না। বি এ কর্মযোগী, দ্যাটস অল। জড়িয়ে পোড়ো না। সেই সার কথা, পাকাল মাছটি হয়ে পিছলে বেড়াও সব সময় ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা কর নিজের বোয়েন্সিতে।'

'তাইতো বলতে চেয়েছি, তোমার নিজের প্যাঁচালো, প্রভাবিত মনের রিফ্লেকসানে সত্য ত্রেতা, দ্বাপর কলি পুরাণ, বর্তমান সব এক করে ফেলেছ। তাইতো সাধক গেয়েছে, "তারা কতদিনে কাটবে বল এ দুরন্ত কালের ফাঁসি"।'

বঙ্কিম তাড়াতাড়ি আয়নাটা উপুড় করে রাখল।

দার্শনিক বঙ্কিমকে উল্টে চাপা না দিলে আসল বঙ্কিমের অফিস যাওয়া মাথায় উঠবে। প্রায় দশটা বাজল।

বারোটা অবদি লেট অ্যাটেনডেনস চলে। তারপর অফিস যাবার আর কোনো মানেই হয় না। এদিকে পেটের যে রকম গুমোট অবস্থা। দ্বিতীয় কাপ চা-টা পেটে পড়লে হয়তো একটু কাজ হত। প্রতিমাকে খেপিয়ে দিয়েছে, এখন কিছুদিন বঙ্কিম এক ঘরে; ধোপা নাপিত সব বন্ধ। তোমার তালে তাল দিয়ে চলতে হবে, তাই না। তুমি আমার মানি প্ল্যান্ট দেখেছ, তাই না। নাড়া দিলেই টাকা পড়বে। ওঃ, সোনার বালা। বঙ্কিম মাথাটা এমন ভাবে ঝাঁকালো, যেন তার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। তার নিজের বিয়ের আংটির সোনাটা তো গেছেই, প্লাস আরো কয়েক পয়সার সোনা, প্লাস মজুরি। বিষ্ণুর দোকানে আড়াইশো টাকা ধার। যতদিন না দিতে পারছে আসা-যাওয়ার পথে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকবে।

ঘরের বাইরে প্রতিমার এলাকায় পা দিয়েই বঙ্কিমের ক্ষোভটা আবার উথলে উঠল। বিয়ে করে ঘোড়ার ডিম তার লাভটা কি হয়েছে। এর চেয়ে ব্যাচেলার থাকলে কত আরামে থাকত। তাড়াহুড়ো না করলে আর একটু বাজিয়ে, দেখে শুনে বউ আনা যেত। আর একটু চোখা নাক, টানা চোখ, ধারালো মুখ, আর একটু ভালো ফিগার, মৃদু ভাষী, নম্র, সমর্পিতা, ছোট নিট পরিবার। এ এক ডাকা হাঁকা ধ্যাদ্ধেড়ে জিনিস। যত পুরোনো হচ্ছে তত আওয়াজ বাড়ছে।

বঙ্কিম যেন পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী ক্ষতবিক্ষত মানুষ। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বঙ্কিম বেশ জোরে জোরেই বলল, 'যতসব থার্ড ক্লাশ ব্যাপার। প্রেজেনটেশানের লোভে ঝেঁটিয়ে নিমন্ত্রণ করছে আর যতসব পচা জিনিস গিলিয়ে মানুষ মারার তাল করেছে। দেশের শত্রু, মার্ডারার!'

মুখ সামলে। প্রতিমা রান্নাঘর থেকে ফোঁস করে উঠল। বঙ্কিম এইটাই চাইছিল। চেঁচামেচি করে অন্তত মনটা খোলসা হোক, 'মুখ সামলে' কি। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। এত জায়গায় নেমন্তন্ন খেয়েছি এ রকম পেটের অবস্থা কখন হয়নি। নেভার।'

মাত্রা না রেখে খেলে ওই রকমই হবে। আমরাও তো খেয়েছি। আমাদের কিছু হল না; ওনারই সব হয়ে গেল।'

'তোমার যে বাপের বাড়ি। বাড়ির সব কিছু অমৃত সমান।'

'কোনটা পচা ছিল—' প্রথম তেল। ওটা তেল নয়, ডিজেল। মাছগুলো মর্গ থেকে এনেছে। ওই বোগড়া চালে কোনো শিক্ষিত লোক ফ্রায়েড রাইস করে না। মাংস ধাপা থেকে তোলা। মিষ্টি কাগজের মণ্ড থেকে তৈরি। পেটে ওই মালের ধাক্কা সামলাতেও আরো দুশো যাবে। হাজার টাকার বালা দুশো টাকার ঠেলা। শ্বশুরবাড়ির নিকুচি করেছে। বুরুশ ঝাড়তে ঝাড়তে বেশ জুতসই করে বঙ্কিম আক্রমণ শানিয়ে নিলে।

'ও, বালার দামটা মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। আড়াইশো থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে হাজারে উঠল।'
'আজ্ঞে না, ঘর থেকে যে সোনাটা গেল তার দামটা তখন ধরা হয়নি।'

'সেটার আবার দাম কি? ও সোনা তো ও বাড়িরই। মাছের তেলে মাছ ভাজা।'

'বাঃ, ভালো যুক্তি! তার মানে তুমি বলতে চাইছ, বিয়ের সময় যা ছিটেফোঁটা দিয়েছিল সব এই ভাবেই উসুল করে নেবে?'

'উসুল করে নেবে কেন? তোমার কেনার ক্ষমতা থাকলে কিনে দাও। নেই বলেই এই অবস্থা। অন্য কোনো বউ হলে এইভাবে ঘরের সোনা দিত বার করে? নেহাত আমার মতো বউ পেয়েছিলে তাই বর্তে গেলে।'

আহা কি উদারতা? আমার কোনো রিলেটিভের বিয়ে হলে দিতে?'

'রামঃ, তোমার রিলেটিভরা আমাকে কি দিয়েছে, যে আমি দোবো। যারা দেয় তাদেরই গায়ে গায়ে শোধ করে দিতে হয়। একেই বলে শোধ বোধ। কিছু নিলেই কিছু দিতে হয়।'
'সমান সমান হতে আর কত বাকি?'
'ওঃ এখনো অনেক বাকি? সমান সমান হতে সব ভাই ফুরিয়ে যাবে। আর তো মাত্র দু-ভাই বাকি।

এখনো এই চার চার আট গাছা চুরি আছে। গলার হার আছে। আমার আংটিটা আছে। আইবুড়ো বেলার দুল দুটো আছে। নাকছাবি

আছে।'

আরো আছে। একটা পালিশওঠা খাট আছে, ছেঁড়া তোশক আছে, দাগ-লাগা লেপ আছে, আমার বিয়ের পোকায় ফুটো সিল্কের পাঞ্জাবিটা আছে, জোড়ের কাপড় আছে, একটা জলচৌকি আছে, স্টিলের ট্যাংক আছে, কয়েকটা কাঁসার বাসন আছে, আর আছে তোমার হাতঘড়িটা। ছেলেমেয়ের আধাআধি ভাগ। হাফ আমার, হাফ তোমার। তোমার হাফটা শ্বশুরবাড়িরই প্রাপ্য।'

'ওদের অতটা ছোট লোক ভেবো না। তোমার মতো অত চুলচেরা হিসেবে ওরা চলে না।'

'খুব চলে। তা না হলে তোমার এই রকম স্বভাব হয়। এ বাড়ির আদ্দেক মালই তো ও বাড়িতে পাচার। ওদের হল সেই থিয়োরি—ভূমি যার ফসল তার। আমি হলুম ভাগ চাষী, তোমার সয়েলে বারো বছর চাষ করছি। ফসল সব ওই গোলায়। আমার ভাগে বুড়ো আঙুল। একটা হিসেব কেবল তোমাদের হিসেব থেকে বাদ পড়ে গেছে। আর সেই হিসেবের বেলায় জেনে শুনে অন্ধ হয়ে থাকাই ভালো।'

প্রতিমা ঘেঁস ঘেঁস করে লাউ কাটতে কাটতে বললে, 'সেটা কি? আমার হিসেবে ওদের এখনো অনেক পাওনা।'

বঙ্কিম মাথায় তেল মাখতে মাখতে বলল, 'এই যে বারোটি বছর তোমাকে ভাত কাপড়ে পুষছি, তার কস্টটি তো বাছাধন করে দেখোনি। ডেলি এক সের চাল, এক চাকা মাছ, আলু, পটল, কপি, মুলো, কচু ঘেঁচু গাজর মাজর, চা চিনি ডাল দুধ, শাড়ি জুতো সিনেমা থ্যাটার। এসব দেবোত্তর প্রপার্টি থেকে হচ্ছে, না গৌরী সেনের ফাইনানসে! 'তার বদলে সার্ভিস যা পাচ্ছ চার ডবল।'

'আরে যাও, মাসে একশো টাকা দিয়ে একটা মেয়েছেলে রাখলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমার সেবা করত। তাকে হুকুম করা চলত। তটস্থ হয়ে থাকত। তোমার মতো মাথায় চড়ে বসত না। আমার ব্লাডার লিক করে দিত না। যে নৌকোয় চড়ে নদী পার হচ্ছ সেটার তলা ফাঁসাবার জন্যে আকুলি বিকুলি করত না। একে কি বলে জানো, সাবোতাজ, অন্তর্ঘাত।'

প্রতিমা আধখানা লাউ ধমাস করে আনাজ রাখার চুবড়িতে ফেলে, উঁহু উঁহু করে উঠল। বঙ্কিম আড় চোখে দেখল। আঙুলের মাথা থেকে ঝুঁজিয়ে রক্ত পড়ছে। প্রতিমা উঠে দাঁড়াল। কয়েক ফোঁটা গাঢ় লাল রক্ত মেঝেতে পড়েছে। কুঁচো কুঁচো সাদা নরম লাউ জায়গায় জায়গায় লাল। বঙ্কিম আঙুলটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কেটেছ তো! একেবারে অকর্মণ্য। ওয়ার্থলেস টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি।'

'একেবারে অকর্মণ্য! সকাল থেকে কানের কাছে বক বক করে মাথা খারাপ করে দিলে। কিনা একটা বালা!'

প্রতিমার চোখে জল। বঙ্কিম আবার অশ্রুজলে বড়ই কাতর হয়ে পড়ে। রক্তের ঊর্ধ্ব চাপ ইতিমধ্যেই নামতে শুরু করেছে। আঙুলটার জন্যে এখুনি কিছু করা দরকার; অন্তত মানবিক কারণে। বারো বছরের জীবন-সঙ্গিনী। রাগ করে কতক্ষণ কথার চাবুক মারা যায়? বঙ্কিম বললে, 'দাড়াও দাড়াও, ডেটল দিয়ে দি। আগে সাবান দিয়ে ধুই।'

'থাক থাক, আমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না। আমার জন্যে একেই দেউলে হয়ে গেছ! আমি মরলেই তো তোমার জ্বালা জুড়োয়।'

প্রতিমা হন হন করে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। বঙ্কিম মনে মনে বললে, মানুষের মৃত্যু যদি অতই সোজা হত। কত বড় বড় দুর্ঘটনায় ছিন্ন ভিন্ন মানুষকে জোড়া লাগিয়ে বাঁচিয়ে দিচ্ছে এ তো সামান্য আঙুলটা একটু উসকে গেছে। সুযোগ পেয়ে গেছে, 'এইটাকেই এখন মূলধন করে একচোট আপারহ্যান্ড নেবে। তারপর ভাবল দোষ কি? সে যদি বালা নিয়ে সারা সকাল মাতামাতি করতে পারে, প্রতিমা কাটা আঙুল নিয়ে লড়ে যাবে, এ তো খুব স্বাভাবিক?

বঙ্কিম সাবান দিয়ে তেল হাত ধুয়ে তাক থেকে ডেটলের শিশি নিয়ে শোবার ঘরে যখন এসে ঢুকল প্রতিমা তখন একখানি ন্যাকড়া দিয়ে বাঁ হাতে ডান হাতের কাটা আঙুলটা জড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ন্যাকড়াটা ইতিমধ্যে রক্তে লাল হয়ে গেছে। পাকা কলার মতো ঠোসা ঠোসা আঙুলে কি কম রক্ত। বঙ্কিম বললে, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, কি একটা যা-তা ন্যাকড়া ডেটল না দিয়েই আঙুলে জড়াচ্ছে। এখুনি বিষিয়ে উঠবে যে।

'ওঠে উঠবে, আমার উঠবে, তোমার তাতে কি?'

প্রতিমার কথায় চাবুক খাওয়া লোকের মতো বঙ্কিম টান টান হয়ে গেল। ইস, বচনের ছিরি দেখ! হারব বললেই হারে গা, খামচে খুমচে মারেগা। বঙ্কিম হুঁ হুঁ করে একটু শীতল হাসির ঢেউ তুলে বললে, 'আমার কি, তাইনা? একটা কিছু হলে তখন কোন সম্বন্ধি দেখবে? কোনো শালা আসবে না। এই শর্মাকেই ডাক্তার বদ্যি করতে হবে চাঁদু।'

'তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তোমার পয়সা ব্যাঙ্কে ডিম পাড়ুক। আমার জন্যে অনেক করেছ। আর করতে হবে না। আমার লজ্জা নেই তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি। আমার বাবা বেঁচে থাকলে এই হাল হত? জেনেই গেছ আমার তো কোনো যাবার জায়গা নেই, তাই অষ্ট প্রহর ধামসে যাচ্ছ।' প্রতিমা বঙ্কিমের দিকে পেছন ফিরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বঙ্কিম মনে মনে বললে, কান্না তোমাদের হাত ধরা। সারা জীবনের অশ্রুজল ধরে রাখতে পারলে ভারতবর্ষে সেচ সেবিত এলাকা আরো বেড়ে যেত। না, তা কি করে হয়! চোখের জল তো আবার স্যালাইন। সামুদ্রিক মাছের চাষ হতে পারত। হাঙর কিম্বা তিমি লাট খেত।' তুলো ডেটলে চুবিয়ে এগিয়ে গেল, 'অফিসের বারোটা বেজে গেল। আচ্ছা ফাঁপড়ে পড়েছি।'

বঙ্কিম তুলো আর শিশি হাতে প্রতিমার পেছন থেকে সামনে এগিয়ে গেল। উত্তরটা ঠিক দিল। আঙুলে কাটতে পারে, তাবলে যা খুশি তাই বলে পার পেয়ে যাবে তা তো হয় না। বঙ্কিম বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে সব হত। তিনি এসে লাউ কুটে দিতেন কারণ মেয়ে বঁটি ব্যবহার করতে জানে না। তিনি থাকলে উনুন ধরিয়ে দিতেন কারণ মেয়ে অন্যের মনে ছাড়া আগুন ধরাতে জানে না। তিনি বেঁচে থাকলে থাকলে স্বর্গে অপ্সরারা নৃত্য-গীত করত, দুন্দুভি বাজাত আর আকাশ থেকে তাক করে এই বাড়ির ওপর পুষ্প বৃষ্টি করত। দেখি আঙুলে থেকে তোমার ন্যাস্টি ন্যাকড়াটা সরাও।'

প্রতিমা বড় দোকানের শোকেসের ঘূর্ণায়মান প্রদর্শনী চাকতির মতো কিম্বা আহ্লাদী পুতুলের মতো আবার ঘুরে গেল। তুলো হাতে ভ্যাবাচ্যাকা বঙ্কিম আবার পেছনে সরে গেল। বঙ্কিম ছাড়বে না। অ্যান্টিসেপটিক লোশান লাগিয়ে নিজে হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে স্বামীর কর্তব্য সে করবেই।



এমন কোনো লুপ হোলস সে রাখবে না যার ফাঁক দিয়ে বিবেক বেরিয়ে এসে বলবে, নির্দয়, হৃদয়হীন পাষণ্ড। প্রতিমাকেও পরে খোঁচা মারার সুযোগ সে দেবে না। বঙ্কিম চক্রাকারে ঘুরে আবার সামলে গেল। প্রতিমা আবার ঘুরে গেল। তিনশো ষাট ডিগ্রির খেলা চলেছে। ঘড়ির কাঁটাও এদিকে ঘুরছে। শেষে আর কোনো উপায় না দেখে বঙ্কিম খপ করে প্রতিমার হাত চেপে ধরল, 'চালাকি পেয়েছ না। বুড়ি বয়েসে ইয়ারকি হচ্ছে? জানো আমার সময়ের দাম আছে, অফিস বেরোতে হবে।'

প্রতিমা হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'কে তোমাকে আটকে রেখেছে। যাও না অফিসে, চলে গেলেই পারো!'

'চলে গেলেই পারো!' বঙ্কিম ভেঙচে উঠল, 'আহ্লাদী পুতুলের মতো কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে না ঘুরে আঙুলে ওষুধটা লাগাতে দিলেই পারো।'

প্রতিমা প্রাণপণে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'দয়া করে আমার হাতে ওষুধ লাগাবার চেষ্টা করে তোমার মূল্যবান সময় আর নষ্ট করতে হবে না। আমার চরকায় আমিই তেল দোবো।

'ইট ইজ মাই চরকা। তেল আমাকেই দিতে হবে। বারো বছরের ইজমেন্ট রাইট। জমির মালিক

আমি। ইউ আর মাই জমিদারি।' বঙ্কিম ভীষণ খেপে গেছে। ওষুধে লাগাবেই।

প্রতিমা আপ্রাণ চেষ্টা করে খামচা-খামচি করেও যখন দেখলে বঙ্কিমের শক্ত মুঠো আলগা হচ্ছে না তখন একেবারেই প্রাকৃতিক কায়দায় খ্যাঁক করে বঙ্কিমের হাতে কামড় বসিয়ে দিলে। খুব জোরে নয়, অনেকটা কুকুরের আদুরে কামড় কিম্বা 'লাভ-বাইটের' মতো। সুখের সময় এই কামড়ের আলাদা অর্থ হতে পারত। ঝগড়ার সময় এই সামান্য কুটকুটে কামড়েরও অন্য মানে। বঙ্কিম হাত আলগা তো করলই না, বরং আরো জোরে চেপে ধরে বললে, 'অতই সোজা না। কামড়াও, যত পার কামড়াও, তলপেটে ষোলোটা ইনজেকসান নোবো, সেওভি আচছা তবু দেখব কতটা নিচে তুমি নামতে পারো। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। ওই দাঁত আমি হাঁ করিয়ে উকো দিয়ে ঘষে ঘষে ফোকলা করে দোবো। কড়মড় করে মাংসের হাড় চিবোনো জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেব।

প্রতিমা এতখানি হাঁ করে বঙ্কিমের হাতটা ধরেছিল ঠিকই তবে সেটা যতটা ভয় দেখাবার জন্যে ততটা কামড়াবার জন্যে নয়।

বঙ্কিমের মনে হচ্ছিল ফোকলা দিদিমা যেন তার হাতটা পাগলাচ্ছে। প্রতিমারও হয়েছে মহাবিপদ। কতক্ষণ কামড়ে বসে থাকবে। সে তো আর কচ্ছপ নয় যে মেঘ ডাকলে তবে ছাড়বে। বঙ্কিম ডেডলক অবস্থাটা কাটাবার জন্যে বললে, যত চাপ পড়বে তত রক্ত বেশি বেরোবে। ছেলেমানুষি করার বয়েস আর আমাদের নেই। মাথা ঠান্ডা কর। যে কোনো এক পক্ষকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। যেহেতু তুমি আহত সেই হেতু পরাজয় তোমারই। আমি তোমার ভালো করতে এসেছি, ভালোরই জয় হয়। ধর্মে, নাটকে, উপন্যাসে, সর্বত্রই এক বিধান।

প্রতিমা বাধ্য হয়েই পাগলাপাগলি বন্ধ করে, মুখ সরিয়ে নিল। মুখের লালায় বঙ্কিমের হাত ভিজে। পরাজিত প্রতিমা খাটের ওপর ধড়াস করে শুয়ে পড়ল। এ ছাড়া কি আর করবে। গো-হারান হেরেছে। বঙ্কিম ওষুধ লাগিয়ে দিল। ইস, বেশ কেটেছে! কয়েক দিন জবরদস্ত ভুগবে। আলমারি খুলে ফার্স্ট এড বক্স থেকে ব্যান্ডেজ বার করে বঙ্কিম দক্ষহাতে আঙুলে জড়িয়ে দিল। আঙুলটা বেশ গোদা হয়েছে। নাও এখন লাগেজের মতো পড়ে থাকো। আমার কাজ শেষ। এ টি এস দিতে হবে নাকি? লম্বা বঁটির কাটায় কি আর এমন হতে পারে! হলে বুঝতে হবে ভাগ্য।

বঙ্কিম বাথরুমে ঢুকে পড়ল। পেটটাকে এখন খোঁচা-খুঁচি করতে হবে। সলিড পাথরের মতো হয়ে আছে। নাঃ, বয়েস সত্যিই বাড়ছে! সামান্য খাওয়াও আর সহ্য হচ্ছে না। তলপেটে গোটা কতক ঘুসি চালাল। প্যাঁক প্যাঁক করে বার কতক টিপলো। নাঃ পেটও অভিমান করে বসে আছে। নিজের পেটই কথা শুনছে না। ডিসওবিডিয়েন্ট। পরের বাড়ির মেয়ে কথা শুনবে! গ্রেট এক্সপেকটেশন বন্ধু। গুমোট পেট নিয়ে কি আর রাস্তায় বেরোনো যায়! বাড়িতে বসে থাকারও উপায় নেই। আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। থাক চানটা তো করা যাক।

স্নান সেরে বঙ্কিম ঢকঢক করে কয়েক গ্লাস জল খেল। 'ছ' চামচ ভাস্কর লবণ। একেই বলে সুখে থাকতে ভুতে কিলোনো। বাবুরা সব বিয়ে করবেন আর ছাইপাঁশ খাইয়ে মানুষের সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তুলবেন। অনেকটা সেই ইললিসিট লিকার খাবার মতো কেস। না খেলে বলবে বড়লোকি চাল হয়েছে শালার। এইবার আসছে পরপর অন্নপ্রাশন। বড়বাজারে স্টিলের বাসনের দোকান তো বাঁধাই আছে। আজকাল দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেই কাজ হয়ে যায়। মালিক জানে লোকে কি চায়। একটা ছোট থালা, পুঁচকে গেলাস আর বাটি। প্যাক করকে দাও। সোনালি রোলেক্স রিবনের বাহার। প্যাকিং চার্জ একস্ট্রা টু রুপিজ বাবু। আবার সেই লুচি ঘি-ভাত, আঁশটে মাছ, এঁচোড়, টেনে ছেঁড়া যায় না মাংস, দই, বোঁদে, পাপড়, চাটনি, রসগোল্লা! ওয়াক!

খাবার কথা মনে হতেই গা গুলিয়ে উঠেছে। ওয়াক। চার গেলাস জল পেটে ঢেউ খেলিয়ে দিচ্ছে। তার উপর ভাসমান ভাস্কর লবণ। হিংয়ের ঢেঁকুর উঠছে। সংসারেও মিউটিনি। পেটেও মিউটিনি। বড় এক গেলাস লেবুর জল খেতে পারলে হত। কে করে দেবে। বিদ্রোহী প্রতিমার আঙুল ফুলে কলা গাছ। তিনি এখন নতুন চাল চালার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। যত বেলা বাড়ছে

বঙ্কিমচন্দ্র ততই কাবু হয়ে পড়ছে। ঘন ঘন ঢেঁকুর। ওয়াক ওয়াক করে সব ওয়াক আউট করে পেটের অ্যাসেমব্লি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাথরুম ঘর, ঘর বাথরুম, ঘণ্টাখানেক এই চলল। ওঃ আই অ্যাম টেরিবলি সিক মাই লর্ড। প্রতিমার চোখের সামনে দিয়ে বঙ্কিমের আসা যাওয়া! সকালের মতো টান টান বুক নেই। গলা দিয়ে চিঁ চিঁ শব্দ বেরোচ্ছে। ভগবান। ক্রমশই কুঁজো হয়ে আসছি। অদ্যই শেষ রজনী মাগো।

ফন্ ফন্ করে পাখা ঘুরছে। বঙ্কিম খাটে চিৎপাত। ঘণ্টাখানেক হিসেব রাখতে পেরেছিল। তুমি আঙুল কেটে টেক্কা মারতে চেয়েছিলে। আমি মিনি কলেরা দিয়ে স্কোর করে বেরিয়ে গেলুম। একবারে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যেও না মাণিক। অন্তর্বঙ্কিমকে বঙ্কিমের রিকোয়েস্ট। দিন ক্রমশ বাদুড়ের ডানার মতো ঝুলে আসছে। প্রতিমা আশেপাশে আছে। কাছাকাছি নেই। দুজনের মাঝখানে সোনার বালার গোল ফোকর। স্বর্ণ ব্যবধান। শেষের সেদিন অতি ভয়ঙ্কর। পা দুটো ঠান্ডা হয়ে আসছে। ও খাট আর বিছানাটা তো শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি। এর উপর মরাটা তো ঠিক হবে না। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা থেকে দাম কেটে নেবে। নেমে শুই বাবা।

বঙ্কিম মেঝেতে সতরঞ্জির উপর নেমে এল। এটা নিজের পয়সায় কেনা। এখানে সে বুক ফুলিয়ে, তাল ঠুকে মরতে পারে। দেহটাও আমার, সতরঞ্জিটাও আমার। কোনো শ্যালকের সম্পত্তি নয়। মেঝেতে শুয়ে তেমন দৈহিক আরাম না হলেও বেশ মানসিক আরাম বোধ করল। ভেতর থেকে তার অন্তরাত্মা বলে উঠল, 'আরে ইয়ার, তলায় শক্ত জমি মাথার ওপর নীল আকাশ, ব্যাস এর চেয়ে ভালো আর কি আছে। সকাল থেকেই তো পবন আহার করে পওহারী। এ যাত্রা যদি বেঁচে যাও এই শুদ্ধ শরীরের ওপরই আগামী বিশুদ্ধ জীবনের ফাউন্ডেশান স্টোন 'প্যাঁ পোঁ প্যাঁপোর পোঁ করে লে কর। জীবনটাকে ওই প্রতিমা, বালা, বিয়ে, ভাত, শ্রাদ্ধে বরবাদ কোরো না। আমাকে বেরোতে দাও, ফাটতে দাও, গ্রেট গ্রেটার, গ্রেটেস্ট হতে দাও।

'তুমি হঠাৎ নেমে শুলে কেন?' প্রায় দশ ঘণ্টা পরে প্রতিমার কণ্ঠে যেন একটু দরদ।

হুঁউ হু আর কি? আমার আর হবে না দেরি, আমি শুনেছি ওই শুনেছি ওই বাজে, বাজে তোমার ভেরী। আমি শুনতে পাচ্ছি ডাক এসেছে, চলে আয়।' বঙ্কিম কুঁই কুঁই করে বললে।

প্রতিমা আঙ্গুল ব্যান্ডেজ করা হাত বঙ্কিমের কপালে রাখল। বঙ্কিম তখন বলছে, 'তাইতো নেমে এলুম। খাট আর বিছানাটা তো আমার নয়। ও তো চলে যাবে। এখান থেকে বের করার সুবিধে। শতরঞ্জি রোল করে খাটিয়ায় লাদাই করে দাও।

প্রতিমা নাকটানার মতো একটু শব্দ করল। হাতটা মাথার চুলে স্থির। বঙ্কিম আর একটু অ্যাড করল, 'বাড়িটা রইল, কিছু টাকাও রইল। অবশ্য তোমার ভোগে লাগবে না। তোমার ভায়েরা দখল করে তোমাকে একটা লাথি মারবে। ছেলেটা আর মেয়েটার জন্যেই ভাবনা। মামাদের ছেলে মেয়ে ধরে, ফাই-ফরমাশ খেটে পাতকুড়োনো হয়তো একটু জুটবে। বড় হলে ফুটপাথ গতি। হা হা, হা ভগবান।

বঙ্কিমের কথা বলতে প্রকৃতই কষ্ট হচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তা না হলে ভবিষ্যতের ছবি আরো গাঢ় রঙে রেখায় আঁকার ইচ্ছে ছিল। প্রতিমা ইতিমধ্যে বেশ বারকতক ফোঁস ফোঁস করেছে। বঙ্কিম উপুড় হয়ে একপাশে ঘাড় কাত করে চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে। খাও, মাঝরাতে ভ্রাতার বউভাতে হাঁড়ি হাঁড়ি দই খাও। সর্দি হবে না? নিমোনিয়া হবে। এখন আর কি? আহ্লাদের সময় বাপের বাড়ি, অসুখ, সেবা, ডাক্তার, বদ্যি, শ্বশুরবাড়ি। তখন বঙ্কিম আছে, গামছা আছে, বঙ্কিমের ঘাড় আছে। শাশুড়ি আছে। প্রতিমার সর্দি নয়। আসলে সে অল্প অল্প কাঁদছে। মনে দুঃখু হয়েছে। বঙ্কিম একটু মৃত্যু-টৃত্যুর কথা বলেছে। সাদা থান, শাঁখা-হীন হাত, সিঁদুরশূন্য সিঁথি, মাছশূন্য দিন। আহা বড় কষ্ট গো। পঙ্গু হয়েও ঘোষালবাবুর মতো পড়ে থাকো, বেডসোর নিয়ে।

সেবাটেবা আমার ধাতে নেই। সকাল সন্ধে দু-মুঠো গিলিয়ে দেব। তারপর মার দেওয়া জর্দা আর দুখিলি পান মুখে ঠুসে সিনেমা, যাত্রা, হ্যাল্লা, ফ্যালা।

প্রতিমা কানের কাছে মুখ এনে জিগ্যেস করল, 'এইবার একটু ঘোল খাবে?'

'ঘোল? ঘোল আর মুখে কেন, এতকাল তো মাথাতেই ঢেলে এসেছ।'

'আঃ এই অসুস্থ অবস্থায় বাঁকা বাঁকা কথা বলতে নেই। শরীরে আর কিছু নেই। কয়েকদিন একটু শক্তি করে নাও, তারপর আবার হবে।'

'ভূতের মুখে রাম নাম। এ যাত্রা যদি টিঁকে যাই, সন্দেহ আছে, তাহলে সাফ বলে রাখছি তোমার বাপের বাড়িতে জল পর্যন্ত খাব না। সব বিষাক্ত। তুমি যাবে, সন্দেশের বাক্স আর উপহারের মোড়কটি নামাবে। থাকতে হয় থাকবে তুমি। আমি আর ওর মধ্যে নেই। তবে একটা সুবিধে, এমনি ওরা কখনই আদর করে ডাকেন না, এই বিয়ে পালা পার্বণেই জামাইয়ের খোঁজ পড়ে। লাটের টাকায় লাটের মালের আদর হয়ে যায়। উড়ো থৈ গোবিন্দায় নম।'

প্রতিমার দাঁত কিড়মিড় করছিল। অন্য সময় হলে লেগে যেত। কোনো রকমে সামলে নিল। সামলে নিয়ে বললে, বালার শোকটা ভোলার চেষ্টা কর। বালার ডবল আমি বাগিয়ে এনেছি। পরে হিসেব করে দেখো। প্রণামীর কাপড়, যেটা আমাকে দিয়েছে, ষাট সত্তর টাকা হবে। কালকে প্রেজেন্টেশান যা পেয়েছিল তার থেকে দুটো শাড়ি, একটা লেডিজ রিস্টওয়াচ ঝেঁপে এনেছি। তাহলে ষাট আর ষাট আর ষাট কত হল।'

'একশো আশি।'

'হ্যাঁ, একশো আশি আর ঘড়িটা ধরো দুশো তাহলে তিনশো আশি। তাছাড়া বিয়ের আগে ছোড়দা দেড়শো দিয়েছিল। সেটা তো আবার মেজদার ধার শোধে চলে গেল।'

'ও হ্যাঁ, তাহলে ফোলডিং ছাতাটা ধরো, ষাট সত্তর টাকা হবে। তারপর একটা বড় স্টেনলেস স্টিলের থালা আর বাটি আটকে রেখেছি। ওগুলোও দেব না।

বঙ্কিমের ভেতরে যেন শক্তি আসছে। দুর্বল ভাবটা যেন কেটে যাচ্ছে। মাথাটা মেঝে থেকে অল্প একটু তুলে দেখল, না, তেমন বোঁ করে ঘুরে গেল না।

প্রতিমা বললে, 'আমাকে কি তুমি এতই ক্যাবলা ভাবো। তুমি কি ভাবো আমি মাল চিনি না। তোমার সব শালাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। একহাতে যেমন দিয়েছি, আর এক হাতে তেমনি আদায় করে নিচ্ছি। দু-চার টাকা এদিক ওদিক হতে পারে। তাও ঠিক উসুল করে নেব। মার পঞ্চরত্নের আংটিটা বাগাবার তালে আছি আর এবার থেকে বলে রাখছি, ভাতে স্টেনলেস নয়, স্রেফ ওই অ্যালুমিনিয়াম।

বঙ্কিম উপুড় থেকে চিৎ হয়ে বললে, 'কাঁচকলা দিয়ে ন্যাংলা শিঙ্গি মাছের ঝোল আর সরু চালের ভাত খাব।'

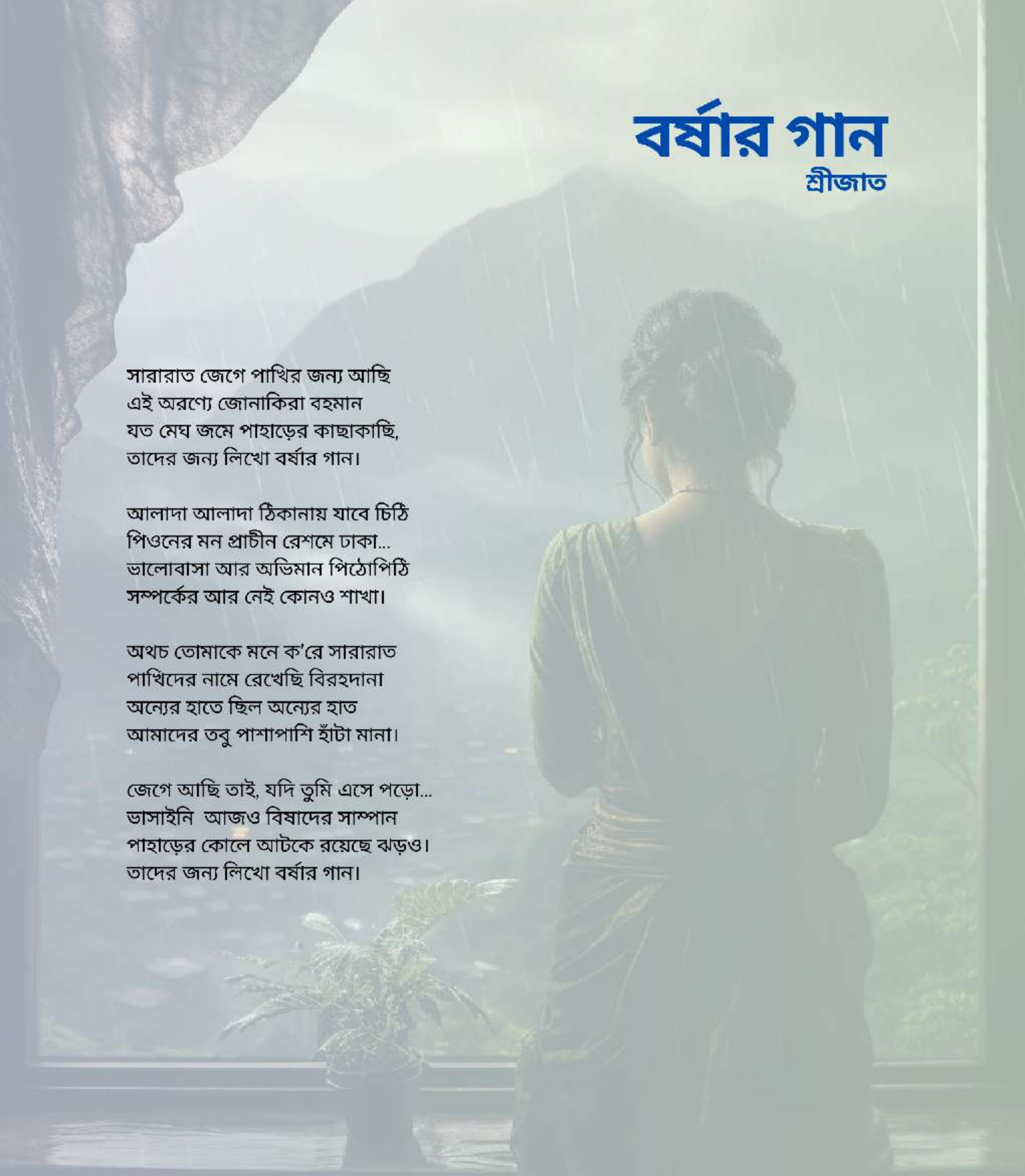
প্রতিমা বললে, 'রাত ন'টার সময় ন্যাংলা আর পাবে কোথায়? এখন চিঁড়ে দই দিয়ে চটকে খাও। কাল সকালে দাম বুঝে মাছের ব্যবস্থা হবে। তা না হলে স্রেফ গাঁদাল পাতার পাতলা ঝোল।'

বঙ্কিম ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। মন বললে, 'এ ওম্যান হ্যাজ মালটিসাইডস।'



বর্ষার গান

শ্রীজাত



সারারাত জেগে পাখির জন্য আছি
এই অরণ্যে জোনাকিরা বহমান
যত মেঘ জমে পাহাড়ের কাছাকাছি,
তাদের জন্য লিখো বর্ষার গান।

আলাদা আলাদা ঠিকানায় যাবে চিঠি
পিওনের মন প্রাচীন রেশমে ঢাকা...
ভালোবাসা আর অভিমান পিঠোপিঠি
সম্পর্কের আর নেই কোনও শাখা।

অথচ তোমাকে মনে ক'রে সারারাত
পাখিদের নামে রেখেছি বিরহদানা
অন্যের হাতে ছিল অন্যের হাত
আমাদের তবু পাশাপাশি হাঁটা মানা।

জেগে আছি তাই, যদি তুমি এসে পড়ো...
ভাসাইনি আজও বিষাদের সাম্পান
পাহাড়ের কোলে আটকে রয়েছে ঝড়ও।
তাদের জন্য লিখো বর্ষার গান।

DEB'S GROCERIES



সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা



DEB'S GROCERIES

5944 BUFORD HIGH WAY DORAVILLE, GA 30340
PHONE: 770-455-3790, WEBSITE: DEBGROCERIES.COM
Owner: Jayanta C. Deb

SELLING BANGLADESHI & INDIAN GROCERIES, CLOTHS, PUJA SAMAGRI, FISH, CHICKEN, GOAT

OUR ALL MEAT 100% HALAL


Chicken Meat


Goat Meat


Hilsha Fish


Rohu Fish


Rice


Spices


Kasundi & Bagabari Ghee


Vegetable

আমরা যে কোনো পূজা বা অনুষ্টানে আপনাদের পছন্দমত ঘরোয়াভাবে বাঙালি খাবার রান্না করে দেই



KALA JAM


SWEET YOGURT


CHICKEN CURRY


BHAPA HILSHA


GOAT CURRY


CHICKEN BIRYANI


KHICHURI


MOTOR PANEER


CHATPOTI/GHUGNI

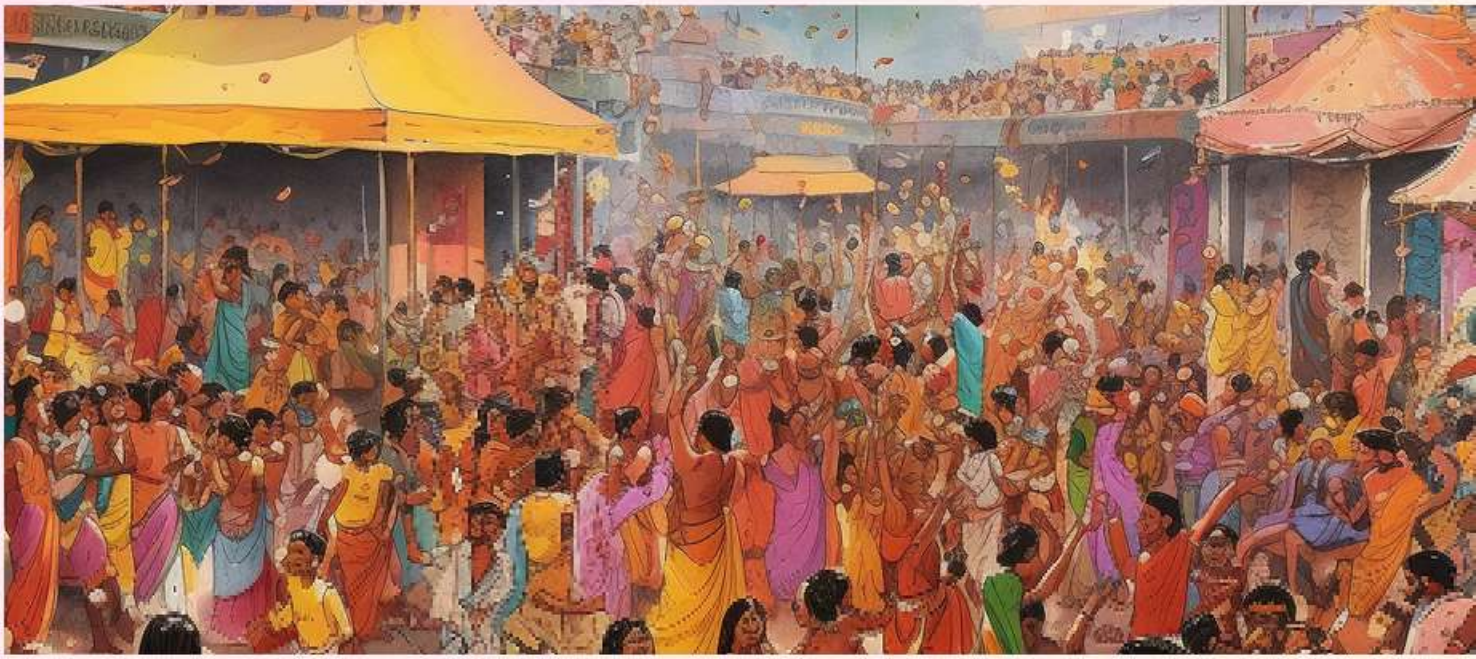

MIXED VEGETABLE

PLEASE MAKE ADVANCE ORDER FOR CATERING AND ANY BIG ORDER FOR FISH & MEAT

DEB'S GROCERIES OFFER 10% OFF ON FISH, CHICKEN, SPICES, CLOTHS & VEGETABLES.

অন্য সময়, অন্যরকম উৎসব

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়



সে ছিল ষাটের দশক। অন্য সময়। তখন প্রতিদিন ভোরের আলো ফুটতেই কর্পোরেশনের লোকজন গঙ্গাজলের লাইনে পাইপ লাগিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে দিতেন কলকাতার রাজপথ আর ফুটপাত। তখনও এই শহরে পথচারীদের হাঁটার জন্য প্রশস্ত ফুটপাত ছিল, দখল হয়ে যায়নি নিরাশ্রয় মানুষ আর হকারে।

তখন এখনকার মতো পথঘাট এলইডি আলোয় এত ঝলমল করত না ঠিকই, কিন্তু ভারি নরম হলুদ বালবের আলো ছড়িয়ে পড়ত সন্ধ্যা নামতেই। আঁকশি লাগানো লম্বা লাঠির নিয়ে গলি থেকে শুরু করে রাজপথের প্রতিটি স্ট্রিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে যেত কর্পোরেশনের ধুতি শার্ট পরা বিহারি কর্মীরা। তখন রাস্তায় গর্ত হলেই পিচ দিতে চলে আসত কর্পোরেশন থেকে। রোলার গাড়ি তখন সবে এসেছে। ঢংঢং করে সে গাড়ি চলত রাস্তা লেবেল করতে।

আদি বাড়ি ওপার বাংলার যশোরে হলেও বড় হয়েছি খাস ঘটিদের নিবাস আদি উত্তর কলকাতায়। গোটা পাড়ায় আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিই ছিল একমাত্র 'বাঙাল'। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলায় আমরা অভিমন্যু, চাটুজ্জে বাড়ি ঠিক যেন একটা দ্বীপ। ইস্টবেঙ্গল গোল খেলেই চারিদিক থেকে হো হো করে ঝাঁপিয়ে পড়ত প্রতিবেশী মুখুজ্জে বোস দত্ত মল্লিক লাহা চক্রবর্তী ফ্যামিলির জ্যাঠা কাকা দাদা বন্ধুরা। ড্যাংড্যাং করে কাঁসর বাজিয়ে বাড়ির সামনে চিংড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে যেত। তাই ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলে দরজা জানালায় খিল এঁটে বসে না থেকে আমাদের উপায় ছিল না।

অবশ্য আমরাও মোটে ছেড়ে কথা বলতাম না। যতই সংখ্যায় অতি ক্ষুদ্র হই এই উত্তরের ঘটি পাড়ায়, হাজার হোক বাঙালের রক্ত বলে কথা! আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিতে লোক তো কম নেই। ইস্টবেঙ্গল জিতে গেলে আমরাও ঘন্টা বাজাতাম, গলির মোড়ে ইলিশ ঝোলানো আমাদের অবশ্য

কর্তব্য ছিল। ঘটিদের বলা হতো ছারপোকা, বাঙালদের বলত জার্মান। জার্মান কি কম কথা, আমরা হিটলারের দেশ! ওরে তোরা ছারপোকা, টিপে মারব, এইরকম একটা হাবভাব। বুঝি না বুঝি, বুক ফুলিয়ে ঘুরতাম।

আবার দোল, জন্মাষ্টমী বা পুজোর সময়ে পাড়ার বাঙাল ঘটি মিলেমিশে একাকার। আত্মীয়তায় নিবিড় পাড়া কালচার, সকলে মিলে আনন্দে মেতে ওঠার সে এক নস্টালজিক সময়। উত্তর কলকাতার বেশির ভাগ বাড়ির সামনেই তখন রোয়াক বা রক। একেকটা রকে একেক বয়েসি মানুষের গ্রুপ, ছুটির দিনে অদূরে বাবলুর চায়ের দোকান থেকে ঘন ঘন চা আসছে, রাজা উজির মারা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এই রকের আড্ডা থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত টেনিদা ও অন্য দাদাদের সৃষ্টি।

এই রক থেকেই ফিসফিস কথোপকথনে আমাদের সেই বালক বয়েসে জানা হয়ে যাচ্ছে, পাড়ার কোন মেয়ে বেপাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে প্রেম করে। তখন আমাদের পাড়ায় এক অলিখিত কানুন ছিল, পাড়ার মেয়ে মানেই সে তোমার দিদি বা বোন। অন্য চোখে তার দিকে তাকালে তোমার কপালে দু:খ আছে। আবার যদি খবর আসে, অমুক বাড়ির গীতাদি যে ছেলেটার সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে বা ময়দানে ঘাসে বসে বাদাম চিবোচ্ছে, ছেলেটা সুবিধের নয়, সেখানেও দাদারা হস্তক্ষেপ করত। প্রথমে গীতাদিকে সাবধান করা হবে, তাতেও কাজ না হলে স্ট্রেট তার মা বাবাকে রিপোর্ট।

আবার ব্যতিক্রমও ঘটত আকছার। কখন যে একই পাড়ার দুজনে ডুবে ডুবে জল খেয়েছে, জানাই যায়নি। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, পাশের বাড়ির বাসুদা চাকরি পেয়েই লাহিড়ী ফ্যামিলির মেজো মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে, তারা নাকি বিয়েও করে ফেলেছে। বছর খানেক পরে বাচ্চা কোলে মনাদি আর বাসুদা এল পাড়ায়, ততদিনে দুপক্ষের অভিভাবকরা ওদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

কিছু কিছু তরুণ আবার তখনই ফেরোশাস টাইপের, যা পারো, করে নাও। প্রেম করেছি, বেশ করেছি, করবই তো! ব্রাহ্মণ বাড়ির মেজ ছেলে ভেকু মুখুজ্জে কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে এল বনেদি বেনে দত্ত বাড়ির বড় মেয়েকে। প্রেমিকাকে সিঁদুর টিদুর পরিয়ে নিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে বলল, ' বাবা, আমরা বিয়ে করে নিয়েছি। ঝুনু, প্রণাম করো। ঝুনু আমার সঙ্গে থাকবে! পরে চাকরি বাকরি পেলে আলাদা থাকব। '

'অ্যাই, খবরদার! ফাজলামো হচ্ছে? নিজে থাকিস বাপের হোটেলে, আবার দত্ত বাড়ির মেয়েকে বউ করে নিয়ে এসেছ! শিগগির ছাড় ওকে, নইলে পিটিয়ে তক্তা করে দোব। '

'সে দিন বাবা, এই যে আপনার সামনে জামা খুলে দাঁড়ালাম। আমরা হলাম লায়লা মজনু। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না বাবা। '

তারপর সারা রাত ধরে চলল বেধড়ক মার। ঝুনুর বাবা খবর পেয়ে তার মাকে নিয়ে পাশের মুখুজ্জে বাড়িতে চলে এলেন। মা হিড়হিড় করে টেনে ফেরত নিয়ে গেলেন মেয়েকে। বাবার লাঠির বাড়ি, কিল চড় লাথি হজম করে প্রেমিক ভেকু শুয়ে পড়ল।

পরদিন খবর এল, ঝুনুকে ওর বাবা অন্যত্র এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই ঠিকানা পাওয়ার চেষ্টা বৃথা হল, ওখান থেকেই ঝুনুদির বিয়ে হয়ে গেল অতি দ্রুত। ফলত ভেকুর প্রথম প্রেমের সমাধি হয়ে গেল চিরতরে।

তবে আমাদের ভেকু চরিত্রটি ছিল অসাধারণ, প্রেম ছাড়া সে বেচারি থাকতে পারত না। মাস দুয়েক পরেই জানা গেল, সে নতুন ছিপ ফেলেছে বোস বাড়িতে। তাকে ও শিউলিকে নাকি দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যের পরে, গায়ে গায়ে লেগে থাকা দুই বাড়ির ছাদে। তারপর? হ্যাটস অফ টু চিরপ্রেমিক ভেকু। সে হাল ছাড়েনি, শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছিল। প্রায় তিন চারজন প্রেমিকা বদলের পরে ভেকু অবশেষে পাড়ার গৌরীদিতে গিয়ে থিতু হয়েছিল।

ভেকুর এই অদম্য প্রেম ও তৎপরবর্তী বারবার ঝাড় খাওয়ার সাহস ওকে রাতারাতি লিডার বানিয়ে দিল। আমাদের চোখে সে বীরত্বের প্রতিমূর্তি, নায়ক! সে ছিল দাদাদের বন্ধু, আমাদের বয়েসিদের সবার ভেকুদা। অবশ্য শুধু প্রেম নয়, ভেকুদা পাড়ার যেকোনো কাজে সবার আগে। কার

বাড়িতে কী দরকার, কী সমস্যা, কাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে... ভেকুদা সবার আগে হাজির।

তখন পাড়ায় একটাই বারোয়ারি পুজো কমিটি। তারাই পরপর দুর্গা থেকে কালীপুজো, সরস্বতী পুজো করে যেত। বলা বাহুল্য, ভেকুদা তার সেক্রেটারি। আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, খুড়তুতো পিসতুতো প্রচুর দাদা ভাইদের ব্যাটেলিয়ন। সবাই আছে দি গ্রেট ভেকুদার সঙ্গে। ব্যতিক্রম ছিলেন আমার বড়দা। তিনি নিজের মতো নাটক সাহিত্য নিয়ে থাকতেন, ঝুটঝামেলায় নেই, কোনো বয়েসের কোনো দলে কোনো অ্যাক্টিভিটিতে নেই। সেজন্য একবার মহা বিপদেও পড়েছিলেন। সে কথায় পরে আসছি।

এবার যেটা হতো, পুজোর চাঁদা তুলতে গিয়ে ব্যাপক মন কষাকষি হতো। সাহা বাবু, সেন বাবুরা কিছুদিন হল বাড়ি কিনে এই পাড়ায় ঢুকেছে, ওরাও ওপারের লোক, বাঙাল। কিন্তু দুজনেই মহা চিপ্পুস। যতই ভেকুদা সদলবলে গিয়ে চাঁদার জন্যে অনুনয় বিনয় করুক, তারা কিছুতেই হাত ঝাড়ছে না। বড়জোর কেঁদে ককিয়ে এক দু টাকা।

লাস্ট চান্স সরস্বতী পুজো। সেখানেও কাপড়ের ব্যবসায়ী সাহা বাবু, বা শঙ্খের ব্যবসায়ী সেন বাবুরা চাঁদা দিতে হাত উপুড় করল না। আর ছিলেন বেনে বাড়ির দত্তকাকা, প্রাক্তন প্রেমিকা ঝুনুদির বাবা, যার জন্য সারারাত পিটুনি খেয়েছিল ভেকুদা। অতএব এই তিনজনেই ভেকুর টার্গেট।

কিছুদিন পরেই দোল। ভেকুদা এসে বলল, ' বুঝলি, সামনের মাসে দোল। এবারে দোলে এদের এমন টাইট দোব, সামনের বার ওরা নিজেরা এসে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়ে যাবে। '

' হুঁ:, কী যে বলো। ওরা দেবে পঞ্চাশ টাকা! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ভেকুদা?'

' আরে ভাই, দ্যাখ না, কী করি। আগে শুধু বল, তোরা সঙ্গে আছিস কিনা। এবারে সাহাবাবু ফার্স্ট টার্গেট। ওনার অবস্থা দেখে বাকি দুজন সিধে হয়ে যাবে।'

' আছি আছি ভেকুদা। '

ভেকুদা তখন সবে সিগারেট ধরেছে। রকের দেয়ালের আড়ালে গিয়ে খুব কায়দা করে হাওয়া বাঁচিয়ে একটা চারমিনার ধরাল। চারিদিক দেখে নিয়ে জোরে জোরে দুটো টান দিল। তারপর বলল, 'দুই বাড়ির সামনে সেদিন সকাল থেকে গার্ড দিতে হবে। দু তিনটে গ্রুপে তোরা ভাগ হয়ে যাবি। তবে হ্যাঁ, এমনভাবে অপারেশন করতে হবে, কোনভাবে যেন ধরা না পড়িস। সব জলের মতো বুঝিয়ে দোব, কেমন? '

সিগারেট খেতে খেতে কী করতে হবে, বুঝিয়ে দিল।

উত্তর কলকাতার দোলে বিশেষ আকর্ষণ ছিল আগের দিন রাতের ন্যাড়া পোড়া। গলির মোড়ে খড় দিয়ে ন্যাড়া বানিয়ে পোড়ানো হতো। ফট ফট শব্দে পুড়ত, আমরা দাঁড়িয়ে হইহই করতাম। সাত সকালে ঘুরতে চলে আসত কীর্তন দল, তারপর আসত শান্তিনিকেতন স্টাইলের রবি ঠাকুরের গানের দল। এরা চলে যাওয়ার পরে শুরু হতো দোল। সে দোল মানে আবিরের দোল নয়, ভয়ানক সব বাঁদুরে রঙ। তবে পাড়ার বয়স্ক গুরুজনদের কখনো রঙ দেওয়া হতো না, বড়জোর আবির দিয়ে প্রণাম করতাম।



আরেকটা অন্যরকম দোল খেলা হতো প্রতিবেশী দাদা কাকাদের বাড়িতে ঢুকে। সেখানে টার্গেট আবার আলাদা। অল্পবয়েসি বৌদি বা যুবতী দিদি, যাদের কাছে অন্যদিন ঘেঁষার সুযোগ নেই, এইদিন কিন্তু অন্য বাড়িতেও ' অবারিত দ্বার'। আমরা তখন বালক, সেসব দেখেই রোমাঞ্চিত হতাম।

অস্বীকার করব না, পরে অবশ্য নিজেরাও সেই নিষিদ্ধ আনন্দের ভাগ পেয়েছি।

প্রথমে সেইবারের 'অপারেশন সাহা' বাবুর ঘটনায় আসি। পরে বলছি, বাড়ির ভিতরের কাহিনী।

অনেক সকালে খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন দল, 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে... ' চলে গেছে। কিছু আগে বেশ বড় একটা রাবীন্দ্রিক গানের দল, বুকে ঝোলানো হারমোনিয়াম বাজিয়ে ' ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল...' আজ সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে...' এইসব গেয়ে গলি পেরিয়ে চলে গেছে।

আমরা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছি। যে যার মতো বিভিন্ন বাড়ির ছাদে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ঠিক দশটা। সাহাবাড়ির কাজের লোক দাশুদা বেরিয়ে এল, হাতে বাজারের থলি। পিছনে আসছেন সাহাবাবু। ধপধপে সাদা হাফ পাঞ্জাবি, পাজামা। বাড়ি থেকে কয়েক পা গেছেন, অতর্কিতে ভয়ংকর বোমা বর্ষণ, দমাদ্দম, দমাদ্দম! বেগুনি রঙ ভর্তি বেলুন বোমা দুজনের গায়ে এসে পড়ছে তিনদিকের বাড়ি থেকে! মুহূর্তের মধ্যে সেই বাঁদুরে রঙ নানা রঙে পালটে গিয়ে দুজনকে ভূত বানিয়ে দিয়েছে।

' অ্যাই অ্যাই কে কে! কে রে? কার এতবড় সাহস! ' সাহাবাবু ছিটকে চলে এলেন গলির মাঝখানে। রাগে আগুন হয়ে দেখতে চেষ্টা করছেন, ঠিক কোনদিক থেকে বেলুন আসছে। কিন্তু কাকে লোকেট করবেন? ডান দিকে তাকাচ্ছেন তো বামদিক থেকে রঙ ভর্তি বেলুন ছুটে আসছে গোলার মতো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাহাবাবুর থোবড়া পালটে গেছে। গায়ে শুধু নয়, বেলুন বোম এসে আঘাত হেনেছে তাঁর মাথায়, সেই বেগুনি কালো লাল রঙ গড়িয়ে পড়ে তাকে চেনাই যাচ্ছে না। পুরো কিম্ভুত।

রণে ভঙ্গ দিয়ে দাশু ও সাহাবাবু দ্রুত ঢুকে গেলেন বাড়িতে। দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক এইসময় ওদের বাড়ির বাসন মাজার ঠিকে মহিলা মন্টুর মা ঢুকছিল। শূন্য থেকে একটা জল ভর্তি (রঙ নয়) এসে লাগল তার শাড়িতে। সে চেঁচিয়ে উঠল, ' ওরে বাবারে, ও বৌদি, আমি চলনু গো। আজ আর আসবুনি। '

সে ঝটপট ফেরার জন্যে ঘুরেছে, ভিতর থেকে সাহাগিন্নির আর্তনাদ, ' ও মন্টুর মা, যাইও না! তুমি জান, আমি বাতের ব্যথায় কিছু পারি না, বাসন সব বের করে দিয়াছি গো। আমি তোমারে নতুন শাড়ি দেব গো, যাইও না। '

মন্টুর মা থমকে দাঁড়িয়েছে। মাগ্যি গণ্ডার বাজারে একটা নতুন শাড়ি পাবে, এ কী কম কথা!

তৎক্ষণাৎ আরেকটা বাঁদুরে রঙ বেলুন আছড়ে পড়ল, না ওর গায়ে নয়, একেবারে সামনে। দু চার ফোঁটা ছিটকে এসে লাগল ওর শাড়িতে।

' উরে ম্যা গো! না না বৌদি গো, পারবুনি। তুমি বড়বাবুকে বলো, কিছু করতে। এই রঙ একবার মুখে লাগলে আর উঠে না বৌদি। '

ছাদের কার্নিশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখছি, সাহাবাবু করুণ মুখ করে বাইরে বেরোলেন। তবে মুখ বলে কিছু নেই, শুধু চোখ দেখে তাঁর দশা মালুম হচ্ছে। উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ' বাবা ভেকু....! কোথায় তুমি বাবা? এবার খ্যামা দাও বাবা।'

বুদ্ধিমান ব্যবসাদার লোক, অপারেশনের উৎস ও কারণ বুঝে ফেলেছেন।

ভেকুদা অদূরে বোসদের রকে নির্বিকার মুখে খবরের কাগজ পড়ছিল। শুনেই কাগজ হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে গেছে, ' আমায় কিছু বললেন সাহা কাকা? '

' হ্যাঁ বাবা।' সাহাবাবু হাতে চাঁদ পেলেন, ' তোমার ব্যাটেলিয়নকে এবার থামতে কও! আমাগো এইভাবে হেনস্তা করত্যাছে ক্যান, জানি না। '

' কী বলি কাকা, বলতেও লজ্জা করছে। ' ভেকুদা মাথা চুলকে বলল, ' কেসটা চাঁদা! '

' চাঁদা! '

' হ্যাঁ কাকা, চাঁদা। ওরা আমাদের পরের ব্যাচ, আমাদের চেয়েও ডেঞ্জারাস। আপনার কাছ থেকে ঠিকমতো পুজো- পার্বণের চাঁদা পাচ্ছে না বলে ভীষণ তেতে আছে। আমায় বলেছে, যদি নেক্সট প্রত্যেকটা পুজোয় আপনার কাছ থেকে অন্তত পঞ্চাশ টাকা না চাঁদা দেওয়ার আশ্বাস আপনি না

দেন, আজ সারাদিন এইরকম চালিয়ে যাবে... ইয়ে মানে আপনাদের হোল ফ্যামিলিকে ঘরে আটকে রাখবে। অনেক মানা করেছিলুম, কিছুতেই আমার কথা শুনছে না। '

' ওরে বাবারে! বাবা ভেকু, ওদের কইয়া দাও, আগামী বছর থিইকা যা চাইছে, কমবেশি তাই দিমু।'

' প্রণাম কাকা, আপনি সত্যিই আমাদের পাড়ার গর্ব। অ্যাই, শুনলি তো সব, শিগগির থেমে যা। ইয়ে কাকা, আরেকটা কথা ছিল... মানে ওরাই আমায় বলেছে। '

' আবার কী কথা! বললাম তো...'

' ওরা বলেছে, আজকে আমাদের পাড়ায় মাংস ভাত হবে, তার জন্য বেশি না, পঁচিশ টাকা দিলেই হবে।'

' উ:, আরও পঁচিশ ট্যাকা! ' সাহাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ' আ-আচ্ছা, তাই হবে অহন।... এই লও।' বলে পাজামার পকেট থেকে পাঁচটা ৫ টাকার নোট বের করে দিলেন।

চারিদিকের বাড়ির ছাদ থেকে বিরাট একটা গর্জন উঠল, ' হিপ হিপ হুররে ... সাহাকাকা যুগ যুগ জিও। '

সেবারের দোল খেলা জমে পুরো ক্ষীর।



রাস্তায় খেলার পরে শুরু হতো পাড়ার সব আত্মীয়প্রতিম বাড়ির অন্দরমহলে বিশেষ অভিযান। বিশেষত যেসব বাড়িতে যুবতী মেয়ে বা বউ আছে, দাদাদের নজর সেইসব বাড়ির দিকে। মিত্র বাড়ির নতুন অলকা বৌদি লুকিয়ে আছে কলঘরে, বা আচার্য বাড়ির বাসন্তী দি লুকিয়ে পড়েছে ছাদের চিলেকোঠায়, কিন্তু কাউকে আজ ছাড়ান নেই। বাইরে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে রঙ শিকারীর দল। আমরা বালকরাও আছি মিতা,জবা, ঝুপুর অপেক্ষায়। আজ সকলের সবকিছু ছাড়!

চারদিক সতর্ক চোখে দেখতে দেখতে সুন্দরী অলকা বৌদি চানঘর থেকে বেরিয়ে এল। অমনি হিংস্র হায়েনার মতো তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেকু বাহিনী।

' আ:, অ্যাই, অ্যাই, কী করছ! ছাড়ো, ছাড়ো! '

' দেখো বৌদি, যত বাধা দেবে, তত বেশি মাখাব। আরে, একদিনের তো ব্যাপার! পরে সাবান দিয়ে তুলে দিও।'

দু তিনজনে তাকে রঙ মাখাচ্ছে, কেউ ডান হাত, কেউ বাম হাত, কেউ কেউ গলায় মুখে ঘাড়ে। মুহূর্তে টকটকে ফর্সা বৌদি বেগনে, শুধু তার চোখদুটো পিটপিট করছে। তবে এই উদ্দাম টানাটানিতে হাতগুলো যে কখনো সাহসী হয়ে গলা বা ঘাড় থেকে আরেকটু নীচে নামত কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে এই না-না কী হচ্ছে, লজ্জারুণ মুখে বললেও ব্যাপারটা তারা উপভোগ করত বলেই মনে হয়।

আমরা সে বয়েসে স্পর্শ নিয়ে খুব কিছু না বুঝলেও মিতা, জবাদেরও এক হাল করে ছাড়তাম। ওদের গায়ে হাত দিয়ে রঙ মাখানো ছাড়াও পিতলের পিচকারি দিয়ে জলরঙ দিয়ে ফ্রক, জামা সব ভিজে চুপচুপে করে দিতাম। ওরা প্রাণপণে নিজেদের ছাড়াবার চেষ্টা করত, তবে এখন বুঝি, সেটা অনেকটাই সত্যি নয়। ওরাও উপভোগ করত।

পরবর্তী কালে আমরা যখন যুবক হই, সেসময়ে এই বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রঙ মাখানো কমে গেছিল। পাড়া কালচার আলগা হয়ে আসছিল। তাছাড়া তখন দোল ক্রমে ক্রমে কদর্য হয়ে উঠছিল। আমাদের জুনিয়র ব্যাচকে দেখেছি, হাই ড্রেনের পাঁক, ছাপার মেশিনের লাল নীল সবুজ

কালি এসব জঘন্য বস্তু ব্যবহার করতে। দেখেছি, ওই বয়েসেই সিদ্ধি খেয়ে টলমল করতে। আতঙ্কিত হয়ে রঙ খেলা থেকে বিরত থেকেছি।

যে সময়ের কথা দিয়ে এ লেখার শুরু, সেই সময়েও কিছু কিছু মানুষ ছিলেন, যারা দোলে রঙ এমনকী আবির খেলারও ঘোর বিরোধী। যেমন, আগেই বলেছি, আমাদের বড়দা। বেশিরভাগ দোলের দিন তিনি দুপুর অবধি দরজায় খিল তুলে বসে থাকতেন। এইসব মানুষকে রঙ মাখাতে পারলে যে কী পৈশাচিক আনন্দ হতো, সে আর কহতব্য নয়।

কিন্তু বড়দাকে কিছুতেই বাগে পাওয়া যাচ্ছিল না। তা সেবার হয়েছে কী, আগের রাতে বাড়ির রঙপন্থী কাকা- দাদারা আমাদের তিন সমবয়েসি কুচোকে খুব তাতিয়ে দিল। তিন কুচো হলাম পিসতুতো ভাই ডবলু, খুড়তুতো ভাই রুরু ও আমি।

' ধুর, ধুর, তোরা কোনো কম্মের নয়। দিলীপকে রঙ মাখাতে পারিস না! '

' তোমরা মাখাও না! ' আসলে আমরা বড়দার গম্ভীর স্বভাবের জন্য তাকে কিছুটা ভয়ও পেতাম।

' আমরা তো ওর প্রায় সমবয়েসি। চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করবে। বড়দাকে (আমার বাবা) গিয়ে কমপ্লেন করবে। বিচ্ছিরি পরিস্থিতি হবে। তোরা এত ছোট, সেটা করতে ও লজ্জা পাবে। শোন,' ছোটকাকু বলল, ' যদি ওকে রঙ মাখাতে পারিস, তোদেরকে অনাদির মোগলাই খাওয়াব। ভেবে দ্যাখ।'

অনাদির মোগলাই তখন আমাদের কাছে অমৃত। তিন কুচোরই চোখ চকচক করে উঠেছে। অতএব সেইবার দোলের দিনে আমাদের মেন এজেন্ডা ' অপারেশন বড়দা।'

সেবার খুব সকাল-সকাল তিন মক্কেল উঠে পড়েছি। বড়দা যেই না প্রাতঃকৃত্য এবং প্রাতঃরাশ সারতে খাবার ঘরে গেছেন, তার ঘরে খাটের তলায় ঢুকে পড়েছি। বড়দা ফিরে ঘরে ঢুকে যেই ছিটকিনি তুলে দিয়েছেন, অমনি তার তিন কুচো ভাই হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তাদের হাতে মুঠো-মুঠো রঙ! বেগুনি, লাল, সবুজ।
বড়দা হকচকিয়ে গেছেন, চোখ বিস্ফারিত, 'অ্যাই! অ্যাই! এ কী! এত সাহস তোদের। শিগগির বেরো! নইলে মেরে ছাতু করে দেব।'

'পারবে না, পারবে না!' মাথা দুলিয়ে তিনটে বিচ্ছু হাসছে, 'আজ দোল! বারোটা পর্যন্ত রঙ খেলার টাইম। তোমায় আজ রঙ মাখাবই!'

বড়দা ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। কয়েকমুহূর্ত। তারপর আমরা কিছু বোঝার আগেই সাঁ করে লম্বা দৌড় দিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে বড়দাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। বড়দা ভ্যানিশ!

আমাদের উত্তর কলকাতার সাবেক চারতলা বাড়ি মস্তবড়। অসংখ্য ঘর। প্রতিটা ঘর, বাথরুম তন্নতন্ন করে খুঁজছি। ইতিমধ্যে আমাদের গুরু কাকা দাদারাও সঙ্গে জুটে গেছেন। সবাই মিলে বড়দা-নিরুদ্দেশ রহস্য উন্মোচনের প্রাণপণ চেষ্টা চলছে।

নাহ্! কোথাও বড়দার চিহ্ন নেই।...ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটা প্রায় ১০টা ছুঁইছুঁই। যাচ্চলে! বড়দার জন্যে কি আমাদের রং খেলার বারোটা বেজে যাবে?

সুতরাং চতুর্দিকে খর দৃষ্টি রেখে প্রবল উৎসাহে দোলপন্থীরা ফের রঙ মাখামাখি শুরু করে দিল, যে দলে আমরাও আছি। ডবলু আমাদের অলিখিত লিডার, সে বলল, ' ঠিক পাকড়াও করব। ঘরে তো দিলীপদাকে ফিরতেই হবে। '

রুরু বলল, ' বড়দা এখন ফিরবেই না, ১২ টা বাজলে তবে বেরোবে।'

এদিকে পুরোনোকালের কুকুরের ছবি দেওয়া এইচ এম ভি গ্রামোফোনে ফুলকাকা চালিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্র সঙ্গীত। দেবব্রত, হেমন্ত, সুবিনয় রায়ের কণ্ঠে পরপর বেজে চলেছে, 'ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরে রঙের ঝরণা....', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...', 'আজ সবার রঙের রঙ মিশাতে হবে...'।

অফুরন্ত আনন্দের দিন। সবাই বাঁধনছাড়া। জোরদার রঙ মাখামাখি চলেছে। বাড়ির বারান্দার লাল মেঝে ভিজে সপসপে।

হঠাৎ ডবলুই ফের বলল, 'সত্যিই তো রে! দিলীপদাকে কি ধরতেই পারব না? অথচ বাড়িতেই আছে। এ আমাদের ব্যর্থতা, মোগলাই মিস। না না, ছাড়া যাবে না। '

আমরা জিজ্ঞাসুচোখে তাকালাম, ' কী করা

যায়, বল তো! '

'চল্, একবার দোতলায় গিয়ে খুঁজি। লাস্ট চান্স।'

'দোতলা! আজ তো ছুটির দিন। দোতলার সব ঘর তালাবন্ধ।'

'কে বলল? লাইব্রেরির বড় হলঘর? ওটা তো বন্ধ হয় না। বড় মামা সামনের ঘরে বসে লেখালিখি করেন। তাই ভেজানো থাকে।' তিন মূর্তি পা টিপে-টিপে পৌঁছে গেছি দোতলায়। লাইব্রেরির বিরাট হলের দরজা খুললাম নিঃশব্দে।

সামনেই বাবার বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, বুক শেল্ফ। তারপরেই সিলিং পর্যন্ত উঁচু বিশাল-বিশাল আলমারি। বেশ কিছু স্টিল ও কাচের। স্লাইডিং। বেশিরভাগই সেগুন কাঠের। দু-পাল্লার। এনসাক্লোপিডিয়া থেকে শুরু করে ইংরেজি বাংলা রচনাবলী ও হাজার-হাজার বইয়ে ঠাসা। হলের সবক'টা জানলা বন্ধ। ভিতরে আবছা অন্ধকার। কোথাও জনপ্রাণীর শব্দ নেই।

ঘুরে-ঘুরে আলমারিগুলো দেখছি । বেড়াল-পায়ে। হঠাৎ একটা সিলিং ছোঁয়া দু-পাল্লার কাঠের আলমারির সামনে এসে ডবলু দাঁড়িয়ে গেল। ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারায় আমাদের ডাকল। ইঙ্গিতে বলল, 'কান পাত্। কিছু শুনতে পাচ্ছিস? ' কান পাতলাম পাল্লার গায়ে। ভিতর থেকে প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ।

তিনজনের চোখ মুহূর্তে রাজভোগ। ভেতরে কে? বড়দা, না কোনও অশরীরী? কিন্তু ভূত হলে তো সে নিশ্বাস প্রশ্বাস নেবে না!

ডবলু আমাদের মধ্যে দেখতে ছোটখাটো, কিন্তু প্রবল ডাকাবুকো। একটানে পাল্লা দুটো সে খুলে ফেলল।

আর অমনি ভেতর থেকে বড়দা আমাদের দেখেই হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আঁ...আঁ...আঁ... ভ্...ভ্...ভূত!'

আসলে সর্বাঙ্গে রঙ মেখে মিশমিশে কালো তিনটে রোগা রোগা ছেলে সত্যিই তখন 'জ্যান্ত ভূতের ছানা'! আরেকটু হলে ওখানেই বড়দা অজ্ঞান হয়ে পড়তেন!

শেষ পর্যন্ত ধরা গেল বড়দাকে। তারপর তিনজনে মিলে হিংস্র উল্লাসে তাকে যে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভূত করে ছেড়েছিলাম, সে বলা বাহুল্য।

বিকেলে ছোটকাকুর আনা অনাদির মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস অবশ্য বাড়ির সকলের তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছিল, বড়দাও। আমাদের মুখে আরেকটু বেশি সুস্বাদু লেগেছিল। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ বলে কথা!



সাঁকো

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়



পর্দা সরিয়ে দিলেই এখানে দিন, পর্দা টেনে দিলেই এখানে রাত। এসির জন্য সবসময়েই শীতকাল। ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে এই নামী হসপিটালটার সিক্সথ ফ্লোরের অর্থোপেডিক ওয়ার্ডের বেডে শুয়ে আছে শাল্মলী। চোখ কাচের জানালার দিকে। এখন পর্দা সরানো। বাইরে বিকেলের আলো হলুদ হচ্ছে ক্রমশ।

বিশাল জানালার এক পাশে স্টিলের হাফ-রাউন্ড ওয়াকারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সাগরিকা আন্টি। শাল্মলীকে বলেছেন, ওখান থেকে কলকাতাকে বিদেশের মতো দেখায়। কিন্তু শাল্মলী হেঁটে ওই জানালাটা পর্যন্ত যেতে পারবে না। কোমরের জন্য তার পা দুটো এখন অচল। তিন-চার দিন পরেই অবশ্য সে ওই জানালাটা দিয়ে কলকাতা দেখতে পারবে, কারণ ডাক্তারবাবু বলেছেন অপারেশনের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই হাঁটাচলা করতে কোনও অসুবিধে হবে না। আপাতত শাল্মলীর চিন্তা জানালার বাইরে ফুরিয়ে আসা বিকেলটা নিয়ে... মা এখনও এল না কেন? অন্যদিন তো আরও আগেই এসে যায়।

ওয়ার্ডের চারপাশে চোখ বোলায় শাল্মলী। ভিজিটিং আওয়ার্স চলছে। সব পেশেন্টের বেড ঘিরে বাড়ির লোক। সাগরিকা আন্টি আর পাশের বেডের অবাঙালি বৃদ্ধাকে দেখতে কেউ আসে না। ওদের জন্য মনখারাপ হয় শাল্মলীর। সে-ও কি ওদের মতো পরিজন-পরিত্যক্ত হয়ে গেল? না, না, মা আসবেই। কোনও কারণে হয়তো অফিস থেকে বেরোতে দেরি হয়েছে, রাস্তায় ট্র্যাফিকের সমস্যাও হতে পারে। এমনিতে মায়ের ছ'টায় ছুটি হলেও ভিজিটিং আওয়ার্স বলে মা তিনটেয় বেরনোর পারমিশন করিয়েছে। সকালের ভিজিটিং টাইমে আসতে পারে না, বাড়ির সব সময়ের কাজের লোক সন্ধ্যাদি আসে।

মামারবাড়ি থেকে দাদু, মামা, মামিরাও ওই সময় এসে ওকে দেখে গিয়েছে। বিকেলে তেমন কেউ আসে না। মা-মেয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে গল্প করে ওই

দু'ঘণ্টা। সেই দু'ঘন্টার পঁয়তাল্লিশ মিনিট অলরেডি গন।

শাল্মলীর কাছে ফোন আছে। তবু মাকে কল করে উতলা করে তুলতে মন চাইল না তার। বাবা শাল্মলীদের সঙ্গে থাকে না। মা চাকরি করে মানুষ করছে মেয়েকে। বাবাকে সামনাসামনি কখনও দ্যাখেনি শাল্মলী, ছবিতে দেখেছে। বাবার সঙ্গে মায়ের কেন ছাড়াছাড়ি হয়েছে? দাদুকে জিজ্ঞেস করে শাল্মলী উত্তর পেয়েছে, দু'জনেরই ভীষণ জেদ। কিছুতেই বনিবনা হচ্ছিল না। মা-কে জিজ্ঞেস করে অবশ্য কোনও স্পষ্ট উত্তর সে পায়নি কখনও। সত্যিই এতদিন পর সে আর তার বাবা-মায়ের ঝগড়া মেটাতে পারবে না। বাবার অভাব বুঝতে না দেওয়ার জন্য মা আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছে সবসময়। স্কুল-কলেজে যখনই বাবা- সংক্রান্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে সে, তখনই শাম্মলীর গতে বাঁধা উত্তর ছিল, "আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই চলে গিয়েছে বাবা, কেন গিয়েছে, সে ব্যাপারে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি।"

এইটুকু জীবনেই দু'বার হসপিটালে থাকা হয়ে গেল শাল্মলীর। প্রথমবার ক্লাস থ্রি-তে মামারবাড়ির খাট থেকে লাফিয়ে নামার সময় কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। এতটাই যে, ভর্তি হতে হয় হসপিটালে। অনেক টেস্ট-ফেস্ট করার পর ডাক্তারবাবু জানিয়েছিলেন শাল্মলী ভুগছে হাড়ের ক্ষয়জনিত রোগে। এই রোগ বংশগত। হাড়ে চোট লাগতে পারে, এরকম কোনও খেলাধুলো চলবে না। মা খোঁজ শুরু করল, তার কোন পূর্বসূরীর এই রোগ ছিল? মায়ের দিকের, না বাবার? এখনও অবধি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তবে রোগটার কারণ হিসেবে শাল্মলীর একটা কথা মনে হয়। শুনতে অদ্ভুত লাগবে বলে সে কথাটা কখনও কাউকে বলেনি। তার মনে হয়, বাচ্চারা তো বাবা-মায়ের হাত ধরে হাঁটতে শেখে। কিন্তু সে শুধু হেঁটেছে তার মায়ের হাত ধরে, তাই অস্বাভাবিকতা বাসা বেঁধেছে কোমরে। একটু দৌড়ঝাপ বা হুড়োহুড়ি হলেই ব্যাথাটা তার নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। কখনও আবার বেশ অনেকদিন ঘুমিয়ে থাকে।

তেমনই ছিল গত কয়েকমাস। চারদিন আগে কলেজে হঠাৎ হুজুগ উঠল, কবাডি খেলা হবে। শাল্মলীও সব ভুলে মেতে উঠল বন্ধুদের সঙ্গে। মায়ের অজান্তে সে এরকম কয়েকবার করেছে। কার যেন হ্যাঁচকা টানে সে ছিটকে পড়ল মাটিতে, অমনই ছোবল মারল পুরনো রোগ। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল শাল্মলী। বন্ধুরা ফোন করল মা-কে। অফিস থেকে চলে এল মা। মনে যতই ঝড় চলুক, জোর করে শান্ত রেখেছিল নিজেকে। বন্ধুদের উলটে আশ্বস্ত করেছিল এই বলে যে খেলাধুলো করতে গেলে ওরকম চোট একটু-আধটু লাগেই, ডাক্তার দেখিয়ে রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়ের রোগটা বাইরের লোক জেনে ফেলুক, তারপর মেয়ে সকলের করুণার পাত্রী হয়ে উঠুক, সেটা তার মা চায়নি। যে ডাক্তারবাবু প্রথম থেকে শাল্মলীকে দেখছেন, তাঁর কাছেই নিয়ে গেল ওকে।

ডাক্তারবাবু দেখে বললেন, "এবারের জখম গুরুতর, ছোট্ট একটা অপারেশন করতেই হবে।"

সত্যিই ছোট তো? নাকি ডাক্তারবাবু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ওরকম বললেন। ফের পর্দা সরানো জানালার দিকে চোখ ফেরায় শাল্মলী। ওয়াকার ধরে ফিরে আসছেন সাগরিকা আন্টি। অপারেশনের পর শাল্মলীকেও কি এরকম ওয়াকার নিয়ে চলাফেরা করতে হবে? কাচের বাইরে ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে আকাশের আলো। মা কি তা হলে এলই না আজকে? মনমরা হয়ে দরজার দিকে তাকাতেই শাল্মলী দ্যাখে, ওয়ার্ড আলো করে ঢুকে আসছে তার মা।

বেডের কাছে এসে মা বলল, "আর বলিস না, অফিসে একটা কাজে আটকে গিয়েছি, তার উপর বেরিয়ে ট্যাক্সি পাই না..." 'কিছু মনে করিনি' টাইপের হাসি হাসছে শাল্মলী, হঠাৎই তার চোখ আটকায় মায়ের হাতে। মা ধরে আছে একটা ধবধবে সাদা রংয়ের পাট করা জেন্টস রুমাল, সামান্য ভিজে। কার রুমাল? যার কথা প্রথমেই মনে এল, বলে ফেলল শাল্মলী, "বাবাকে আসতে দিলে না কেন মা?"

থতমত খেয়ে মা শাল্মলীকে বল, "তুই কী করে জানলি?" অনুমানটাকে সত্যি প্রমাণ করতে তাড়াহুড়ো করে শাল্মলী বলে ওঠে, "তোমার দেরি হচ্ছে, ভাবলাম একতলার বিল মেটাচ্ছ হয়তো,

খবর নিতে ওয়ার্ডের বাইরে নার্সদের ডেস্কে গিয়েছি, এলইডি স্ক্রিনে সিসি ক্যামেরার ডিসপ্লে-তে দেখি তুমি আর বাবা রিসেপশনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ...'' "বাবাকে ডাকব? খুব বেশি দূর যায়নি নিশ্চয়ই..." মা বলল।

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় শাল্মলী। একটু দূরে গিয়ে ফোন বের করে মা। কথা বলে বাবার সঙ্গে। মনে-মনে বিশাল জিভ কাটে শাল্মলী। মা আজ একটু অন্যমনস্ক। তার এত বড় মিসটেকটা খেয়ালই করল না। শ্যামলী তো এখনও হাঁটতে পারে না, সে ওয়ার্ডের বাইরে যাবে কী করে! মেয়ের জন্য মনটা এমনিতেই নরম হয়ে আছে মায়ের। চোখ বন্ধ করে শাল্মলী যেন দেখতে পাচ্ছে, বাবার সামনে কেঁদে ফেলেছে তার মা, তবু বাবাকে মেয়ের কাছে আসতে দেয়নি। আশ্চর্য জেদ মায়ের! মায়ের কান্না দেখে বাবা রুমাল বাড়িয়ে দিয়েছিল, ভুল করে সেটাই নিয়ে চলে এসেছে মা।

বাবা আসছে... আশ্চর্য এক ভাল লাগায় ভরে যায় শাল্মলীর মন। বাবাকে এই প্রথম সামনাসামনি দেখবে শাল্মলী। প্রথমেই সে যা করবে, তা হল বেডের দু'পাশে দাঁড় করাবে তার বাবা-মাকে। তারপর ধরবে দু'জনের হাত। হাঁটতে শেখার সময়ের সেই অভাব সে পূরণ করে নেবে আজ। তাতেই তো অনেকটা সুস্থ হয়ে যাবে সে। অপারেশনের পর ওয়াকার নিয়ে হাঁটার প্রশ্নই আসবে না।

Bundle home & auto. It's easy.

Call me for a quote



StateFarm®

Janis Mosley
Agent

1640 Powers Ferry Rd SE Bldg 24-
Marietta, GA 30067-5456

Bus: 770-575-4981
janis.mosley.rmas@statefarm.co

Availability and amount of discounts and savings vary by state.

State Farm Mutual Automobile Insurance Company, State Farm Indemnity Company, State Farm Fire and Casualty Company, State Farm General Insurance Company, Bloomington, IL

State Farm County Mutual Insurance Company of Texas, State Farm Lloyds, Richardson, TX

State Farm Florida Insurance Company, Winter Haven, FL

ডিভোর্সী

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়



লক্ষ্মীকান্তবাবু দেখলাম মোটামুটি মনঃস্থির করেই ফেলেছেন, ঘরের লক্ষ্মী তাঁর আর দরকার নেই। টাকা পয়সা, স্বাচ্ছন্দ তাঁর ঢের আছে। লক্ষ্মী লাভ এখন লোকসানের জায়গায় পৌঁছেছে। তাই আপাতত বুড়ো বয়সে লক্ষ্মীর চেয়ে যেটা বেশি দরকার তা হলো নিশ্চিন্ত ঘুম। সেই ঘুমে প্রধান বিঘ্ন তিনি দূর করতে চান।

লক্ষ্মীদেবী চুপ করে বসেছিলেন বিষণ্ণ মুখে। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, "উনি যা মনে করবেন, সেটাই হবে। তবে বাড়ি আমার থাকবে। ওই ঘর, ওই বিছানা, ওই রান্না ঘর, ওই বাথরুম। সবকিছুর সঙ্গে আমি তিলে তিলে অভ্যস্ত হয়েছি। সেই লড়াইটা কম নয়। আমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না। ও চাইলে আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে পারে। বাড়ি আমার যেমন আমার আছে থাকবে।"

আমি উকিল মানুষ, লক্ষ্মীকান্তবাবু ও লক্ষ্মীদেবীর ডিভোর্সটা মিউচুয়ালি সহজে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবে একটু প্রমাদ গুনলাম| জমানো টাকার এক অংশ দিচ্ছেন, পেনসনের টাকা থেকে খোরপোষ দিচ্ছেন। এরপর গোটা বাড়ির দাবী কি লক্ষ্মীকান্তবাবু মানতে চাইবেন?

বললাম, "সেপারেশনের কেস যদি পারস্পরিক দোষারোপ নিয়ে কোর্টে ওঠে, তাহলে মিটতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে!"

লক্ষ্মীকান্তবাবু লক্ষ্মী ছেলের মতো সব মেনে নিয়ে বললেন, "বাড়ি ওর নামে দানপত্র করে দেব। আমি শুধু আজ থেকে শান্তি চাই। আপনি ডিভোর্স কার্যকর করার জন্য যা যা করার করুন।"

আমি যা করনীয় তার জন্য কাগজপত্র তৈরি করার কাজ দিলাম অ্যাসিস্ট্যান্টকে। তারপর বৃদ্ধ দম্পতির দিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের সন্তানরা এই সব ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল?"

"বাবা-মার বনিবনা হচ্ছে না, সেটা জানে। ডিভোর্সের দিকে গড়াতে পারে শুনিয়ে রেখেছি।

কিন্তু ছেলেপিলেরা এরচেয়ে বেশি জানার বা বোঝার আগে আপনি ভালয় ভালয় আইনি কাজটা সেরে ফেলুন তো!"

লক্ষ্মীকান্তবাবুর ডিভোর্সের তাড়া থেকে দেখলাম লক্ষ্মীদেবীও উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বললেন, "হ্যাঁ,হ্যাঁ। সেই ভাল। ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস নেই। তেনারা সব বিদেশ থেকে এসে জুটলে নানারকম প্যাঁচ কষে ডিভোর্সে ব্যাগড়া দেবে। ঘুম নিয়ে এত খোঁটা আর সহ্য হয় না। নাক কী আমায় বলে ডাকে, যে আমায় তার দায় নিতে হবে!"

আমি দুজনের সামনে থেকে উঠে পড়লাম। ফিরে তাকিয়ে বললাম, "নাক ডাকার কিন্তু চিকিৎসা হয় আজকাল!"

২

বাড়িতে গিন্নীর সঙ্গে খাবার টেবিলে আলাপচারিতায় লক্ষ্মীবাবুদের লক্ষ্মীমন্ত সংসারে ভাঙনের গল্পটা শেয়ার করলাম। বললাম, "মুকুন্দপুরের দিকে থাকেন। গোপাল মেসোর রেফারেন্সে আমার কাছে এসেছিলেন।"

গিন্নী সব শুনে হেসে বলল, "কখন কোন পয়েন্টে এসে মনে হবে সম্পর্ক আর বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তা কী কেউ বলতে পারে।"

"ভদ্রলোকের সমস্যা ভদ্রমহিলার রাত্রিকালীন নাসিকাগর্জন। ভদ্রমহিলার সমস্যা, ভদ্রলোকের টয়লেট অ্যাক্টিভিটি। কমোডে ফ্ল্যাশ না করা, হিসি করে জল না দেওয়া।"

গিন্নী আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, "বাড়ি যখন আলাদা ঘর, আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা করে নেওয়াই যেত। আসলে দুজনের মধ্যেকার রসায়নটা তিতো হয়ে গেলে, পরস্পরের সব কিছুই বিস্বাদ লাগে।" এরপর গিন্নী কিছু খাবারদাবার মুখে চালান করে চিবোতে চিবোতে বলল, "কত বয়স বললে?"

"তা ভদ্রলোকের সত্তর হবে। ভদ্রমহিলার আশেপাশে। সে কালে ভুবনস্যার না কার রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার স্কুলে প্রেম হয়েছিল। এখন ভদ্রমহিলা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের নামেও দোষ দিচ্ছেন। বলছেন, "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, রবিঠাকুর বলেই গেছিলেন। কিন্তু সেই ভুবন যে ভুবনস্যারের গানের ক্লাস সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। তাহলে তিনি গান শিখতে গিয়ে লক্ষ্মীকান্তবাবুকে এড়িয়ে চলতেন।"

গিন্নীর মধ্যে রসবোধ একটু কম, সে এবার একটু চিন্তিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ছেলে মেয়েরাও দেশে থাকে না। বুড়ো বয়সে ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে একা থাকার গোঁয়াড়তুমি করছে। রোগ-বালাই, বিপদে-আপদে কে দেখবে?"

"ভগবান!" উত্তরটা লক্ষ্মীবাবু আর লক্ষ্মীদেবী যেন একসঙ্গেই দিয়েছিলেন।

দেখলাম, বুড়ো-বুড়ি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েই পা বাড়িয়েছেন। ডিভোর্সপর্ব মিটে যাবার পর মিষ্টি হাসি হেসে আমায় মিষ্টি মুখ করিয়ে গেলেন আলাদা আলাদা করে। এরপর ওঁদের গল্প ভুলেই গিয়েছিলেম নিজের পেশাগত ব্যস্ততায়। কত রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কেস আসে, সেই তুলনায় এ আর এমন কী স্মরণীয়!

ঘটনাটা পুরোপুরি ভুলে যেতাম যদি না মাস ছয়েক পর হঠাৎ একদিন...।

৩

সেদিন কী কারণে যেন মুকুন্দপুরের দিকে গিয়েছিলাম। বেশ ঘোরাঘুরির পর একটা সাজানো গোছানো কফিশপ দেখে ভেতরে ঢুকলাম। কফির অর্ডার দিয়ে হাতের ফাইলটা মেলে একটু চোখ বোলাচ্ছি, অকস্মাৎ পাশের টেবিলটার দিকে নজর পড়তেই চমকে গেলাম। আরে, কী ব্যাপার!



সেই ডিভোর্সী দম্পতি লক্ষ্মীকান্তবাবু আর লক্ষ্মীদেবী না? কয়েক মাস আগে একে অপরকে একদণ্ড সহ্য করতে পারছিলেন না। এখন প্লেটে ফ্রিসফাই নিয়ে খোসগল্প করছেন? আজব কান্ড। আমি উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "চিনতে পারছেন?"

হঠাৎ করে আমার সামনে একটু অপ্রস্তুতিতে পড়ে গেলেন দুজনে। পরমুহূর্তেই কিছুটা সপ্রতিভ হয়ে বললেন, "আরে, আপনাকে কখনও ভুলতে পারি উকিলবাবু। আপনি আমার বন্ধু গোপালের পরিচিত। আমাদের এত বড় উপকার করলেন। আপনি একা হাতে সবটা নিষ্পত্তি না করলে আমি কী আর বুড়ো বয়সে ডিভোর্সের ঝামেলা সামলাতে পারতাম!"

"সে হয়তো একটু ঝামেলার বিষয়ই ছিল!" আমি একটা চেয়ার টেনে ওঁদের পাশেই জায়গা করে নিলাম, "কিন্তু আপনাদের এই অবস্থায় দেখে মনে হচ্ছে শুধু শুধু সেই ঝামেলারই বা কী দরকার ছিল?"

"খুব দরকার ছিল বুঝলেন! না হলে বড় বিপদ হয়ে যেত।" লক্ষ্মীকান্তবাবু তাঁর দুহাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা আমার হাতটা চেপে ধরলেন। যেন অনেকটা কৃতজ্ঞ আমার ওপর।

"কফিপর্ব শেষ করে আধ ঘণ্টা একটু সময় দিতে পারবেন?" লক্ষ্মীবাবু অনুনয় করার ভঙ্গীতে বললেন, "এখান থেকে হাঁটা পথ। আমাদের জীবনের অন্দরমহলটা একবার দেখে আসবেন।" আমার হাতে আসা সব ডিভোর্সের কেসই এমন তিক্ততা ভরা ছিল যে এই আলাদা হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ জুটির পুনর্মিলনের রসায়নটা বেশ রহস্যময় ঠেকছিল। ভাবলাম কিছু সময় তো হাতে আছে। একবার ঘুরে আসাই যায়।

কাছাকাছি বলে লক্ষ্মীবাবুর ফ্ল্যাটেই গেলাম। দেড়-কামরার ভাড়া ফ্ল্যাটে ভদ্রলোকের শরীর থাকলেও, মন খুব একটা থাকে বলে মনে হোল না। ভীষণ অগোছালো, নোংরা ঘর। পরিছন্নতার শৌখিনতা থাকলে এমন লোকের সঙ্গে ঘর করা মুশকিল। কিন্তু তা বুঝতে ভদ্রমহিলার সত্তর বছরের ম্যাচিওরিটি লাগল কেন। আর এখন আবার এই গলায় গলায় ভালবাসার কারণটাই বা কী? ভদ্রমহিলা বললেন, "এটা তো গুদামঘর! এখানে সন্ধ্যের পর কেউ থাকে না। আমাদের বাড়িতে একবার আপনাকে আসতেই হবে। একদিন আমরা তিনজনে মিলে খাওয়াদাওয়া করব। জানেন তো আমি কিন্তু রন্ধন শিল্পে দ্রৌপদী। শুধু, মাত্র এক স্বামীর সঙ্গেই জীবন কেটে গেল, এই যা।"

আমি এবার হালকা হতাশা প্রকাশ করে বললাম, "সারাজীবন আর কাটল কোথায়?"

"আপনি কী ধরে নিয়েছেন, আমাদের সত্যি সত্যি বিচ্ছেদ হয়ে গেছে?" লক্ষ্মীকান্তবাবু এবার শব্দ করে হেসে ফেললেন।

"পেটের ছেলে মেয়েরা কুসন্তান হলে অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মাকে বেঁচে থাকার জন্য কত রকম চালাকি করতে হয়, তা তো জানেন না। এ তো মিথ্যে ঝগড়াঝাটির গল্প ফেঁদে একটা আইনি ডিভোর্স! "

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম ওঁদের দু:খের কথা। লক্ষ্মীকান্তবাবুর ওপর ছেলে, জামাই দুজনে দুজনের মতো করে বল প্রয়োগ শুরু করেছিল বড় বাড়িটা ফ্লাটের জন্য বিক্রি করে দেবার জন্য। এই অবস্থায় কী করেন।

লক্ষ্মীদেবী বললেন, "উনি শান্তশিষ্ট মানুষ, মুখের ওপর দুর্ব্যবহার করতে পারেন না। ওদিকে ছেলে, মেয়ে, জামাই চোখের সামনে কোটি টাকা দেখছে। ওই বাড়ির পিছনে আমাদের কত ভালবাসা, কত স্মৃতি পড়ে আছে হতভাগারা কী বোঝে। তাই দুজনে ঠিক করলাম বাড়ির মালিকানাই যদি বদলে ফেলা যায়!"

আমি দুজনের মুখের দিকে নরম দৃষ্টি বুলিয়ে বললাম, "অভিনব আইডিয়া সন্দেহ নেই। কিন্তু ফুলপ্রুফ কি হলো? মা হিসেবে আপনাকে চাপ দেয়নি, বাড়ি বিক্রি করার?"

"বুড়ো বয়েসে ডিভোর্স একটা উত্তাল ঘটনা বুঝলেন। ছেলেমেয়েদের ওপর ধাক্কাটা বেশ জোরেই লেগেছিল জানেন। তাছাড়া কোন অধিকারে চাপ দেবে? আমি তো মা হিসেবে ছেলে মেয়েদের কাস্টডি চাইনি। আমি এখন ওঁদের বাবার ডিভোর্স দেওয়া একজন বাইরের মেয়েছেলে!"

কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রমহিলার চোখের কোনটা একটু চিকচিক করে উঠল। আনন্দাশ্রু না কষ্টের বহিঃপ্রকাশ কে জানে।

লক্ষ্মীকান্তপুর এবার হাত জোর করে বললেন "একদিন সন্ধ্যের দিকে আসুন না আমাদের বাড়িতে। আমিই আপনাকে নিয়ে আসব। সন্ধ্যের দিকে, কারণ অন্ধকারে প্রতিবেশীরা যাতে কিছু আন্দাজ করতে না পারে। ভাবে বুড়ো বাড়ি থেকে বিতারিত হয়ে বাড়ি দখলের জন্য উকিল নিয়ে এসেছে। আদতে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, একটু কোয়ালিটি টাইম পাশ হবে।"

আমি নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাইরের দিকে এগোলাম।

লক্ষ্মীদেবী আবার নীচু গলায় অনুরোধ করলেন, "আসবেন তো?"

বললাম, " নিশ্চয়ই! বাড়ি তো অনেক দেখেছি। কিন্তু বাড়ি কী করে মন্দির হয়, তা দেখার সুযোগ হারাই কী করে!"



THE LARGEST SELECTION OF INDO-PAK GROCERIES

- FRESH PRODUCE
- SNACKS
- SWEETS
- SPICES
- LUGGAGE
- COOKWARE
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND MUCH MORE

OUR CONVENIENT LOCATIONS

ATLANTA- DECATUR
751 Dekalb Industrial Way
Decatur, GA 30033
Tel: 404-299-0842

ALPHARETTA - CUMMING
2255 Peachtree Parkway
Cumming, GA 30041
Tel: 770-888-4141

DULUTH - GWINNETT
3890 Satellite Blvd
Duluth, GA 30096
Tel: 770-476-0522



Groceries delivered by

instacart

CHERIANS

INTERNATIONAL GROCERIES

www.cherians.com

FOLLOW US ON

Announcing the opening of our Designer Boutique...



SHADES

FASHION LOUNGE BY SABINA



- Designer Indian & Pakistani outfits
- Sarees
- Gowns
- Sharara Sets
- Lehenga Choli
- Indo Western & Designer Jewelry
- Clutches
- Shoes

Everything a woman will love under one roof!



3230 Caliber Street, Suite D106, SUWANEE, GA 30024

470-695-4914

Shadesby_Sabina

ভালোবাসার জন্য

রুদ্রশংকর

বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকায় রুদ্রশংকরের লেখালিখি শুরু নব্বুয়ের দশকে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা আট ও স্বাভাবিক ছন্দময়তার কারনে অনেক কবিতা সুরারোপিত হয়েছে। ২০১৬ সালে ভাষানগর পুরস্কার, ২০১৯ সালে বই-পার্বণ সম্মাননা ও কবিতা অবলম্বনে নির্মিত গানের জন্য ২০২০ সালে মিরচি মিউজিক এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

ভালোবাসার জন্য প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করি আগুন
প্রতিদিন পিছলে গিয়ে ফিরে আসি বিছানায়
কিন্তু এখন আর দেনা-পাওনার হাতগুলো ছাড়া কি আছে?
ক্ষমতা দেখিয়ে কি কারোর ভালোবাসা পাওয়া যায়?

অনেকদিন হল তোমার দিকে তাকিয়ে কবিতা লিখিনি
তোমার নিঃশ্বাস পড়েনি কপালে
মনে হয় বাদামী রঙের শূন্যতা এসেছে
অথচ মাথায় ফিসফিস করে বৃষ্টি হয়, কাকেরা ঠোক্কর মারে
পরিচয়ের মধ্যে পরিচিত সন্দেহগুলো ভেঙে যায়

ভালোবাসার জন্য প্রতিদিন ভিজে হাতে জামাকাপড় খুলি
নিজেকে শেষ করার আগে পোকারা কুরে খায় স্বপ্ন
হয়তো আমার এই অসুখ কোনদিন সারবে না
তারপরেও মহল্লায় কথা হয়, মুখোমুখি মিটমাট হয়
ভালোবাসার জন্য এই যে বেঁচে আছি, এও এক পিপাসা।

রোবটের রূপকথা

রবীন্দ্র চক্রবর্তী

রবির তরুণ স্কুলজীবন কেটেছে শান্তিনিকেতনে। সেই শালবীথি, আম্রকুঞ্জ, ছাতিমতলা, কাঁকুড়ে রাস্তা, আশ্রমদ্বারের ওপর লেখা "আনন্দরূপমামৃতম যদ্বিভাতি" বাণী আজো তাঁর মনে তাজা। ১৯৯০ সালে উচ্চশিক্ষা খাতিরে পাড়ি দেন আমেরিকায়। ১৯৯৫ সালে পি. এইচ. ডি. অর্জন করেন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ। সেই থেকে কর্মজীবনের শুরু। বর্তমান বাস আটলান্টায়। গত তেত্রিশবছরের এই দ্রুতগতি আমেরিকার জীবনের মধ্যেও রবীন্দ্রস্পর্শ ও বাংলাভাষা অবিরল এনে দিয়েছে পরম স্নিগ্ধতা। পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত তাঁর বই "প্রবাসের গপ্পোসপ্পো", "প্রবাসের আরো গপ্পো" ও "প্রবাসের কথকতা" দেশে-বিদেশে বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাছাড়াও তাঁর লেখা ভারতে ও আমেরিকার প্রায় দশটা সংস্থার পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তাঁর গল্পের সংকলন "Smiles from Miles" ইংরিজিতে অনূদিত হয়েছে।

আজ থেকে অনেকদিন পরের ঘটনা। সেই ভবিষ্যতের রূপকথার দেশে ছিল একটা বিশাল গবেষণাগার। এই গবেষণাগার ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মন্দির। চারপাশটা ছিল সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। দূরে একটা নদীর জলপ্রপাত বিল্ডিংটার উঁচু তলা থেকে দেখা যেত। সেই উঁচু তলায় কাজ করতেন জানকী সেন। তিনি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একজন অগ্রণী বিজ্ঞানী। তাঁর রিসার্চ বিষয় রোবটিক মিউটেশান। এমন ভাবনা আগে কেউ কোনোদিন শোনেন নি। ড: সেনের গভীর বিশ্বাস যে পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তন যদি বাঁচার তাগিদে হয়ে থাকে তবে রোবটকে সচেতন করতে হলে তার অস্তিত্বকে ভয় দেখাতে হবে। তৈরী করতে হবে এক অভিনব রোবট ভাইরাস যা প্রতি পদক্ষেপে রোবটকে চ্যালেঞ্জ করবে। তার নির্দিষ্ট কাজের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

বহুবছর পরিশ্রমের পর তৈরী হয় সেই ভাইরাস কোড। সেদিন ছিল সোমবার। তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক দিন। ভাইরাস কোড দিয়ে জানকী তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রোবট শঙ্কুকে আক্রান্ত করে বাড়ি ফেরত এসে সারারাত বিছানায় ছটফট করতে থাকেন। ঘুমোতে পারেন না। এক গাদা কথা মনে পড়তে থাকে। রোবটের মধ্যে শঙ্কু ছিল সবার সেরা। তাকে দেখে বোঝা যেত না সে মানুষ না রোবট। তার ত্বক ছিল মানুষের মতো যদিও আর্টিফিসিয়াল ফ্যাব্রিক দিয়ে বানানো। শঙ্কু বিশ্বের সমস্ত ভাষায় কথা বলতে পারতো। সে দরকার মতো গায়ের রঙ বদলাতে পারতো; নিমেষের মধ্যে সুপুরুষ বা সুন্দরী মেয়ে সাজতে পারতো। গলার স্বর বদলাতে পারতো।

একবার একটা ফ্রেঞ্চ টিম এসেছিল গবেষণাগারে। জানকী তখন শঙ্কুকে এক অপূর্ব সুন্দরী ফ্রেঞ্চ যুবতী সাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন কনফারেন্স রুমে। ফ্রেঞ্চ টিমের জিভ থেকে লোল টপকেছিল। জোয়ান থেকে বুড়ো বিজ্ঞানী সবাই শঙ্কুর ফোন নম্বর চেয়েছিল। জানকী মনে মনে ভীষণ গর্ববোধ করেছিলেন। কেউ ধরতেও পারে নি যে শঙ্কু তাঁর বানানো একটা রোবট।



জানকী শঙ্কুর সাথে সচরাচর বাংলাতেই কথা বলেন। ফ্রেঞ্চ টিম চলে গেলে জানকী মজা করে বলেছিলেন, "যখন তুই আমার সঙ্গে একা থাকবি, তুই আমার ছেলে সেজে থাকবি, বুঝলি? আমি তোর মা!" শঙ্কু ভুলতে জানতো না; তাই জানকীর আদেশের সে কোনোদিন অমান্য করে নি।

এরপর জানকী কখন যে নিজের অজান্তে শঙ্কুকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতে শুরু করেন তিনি তা নিজেও জানতে পারেন না। আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানকীর মনে কেমন যেন অজানা আশঙ্কার মেঘ ছেয়ে আসে। পর মুহূর্তে মনে মনে হেসেও ফেলেন তিনি; শঙ্কু তো আর রক্ত-মাংসের তৈরী নয়; তার কি আর ক্ষতি হতে পারে? এমনি করতে করতে ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি করে ল্যাবে পৌঁছে দেখেন শঙ্কুর আচার-ব্যবহারে, কর্তব্যে, কথা শোনায় কোথাও এতটুকু তফাৎ হয় নি। দেখে জানকী একটু নিরাশ হলেন বটে কিন্তু একই সঙ্গে স্বস্তিবোধও করলেন খানিকটা। শঙ্কু এখন বাংলা রান্না শিখছে। জানকী সুক্তো, ঘন্ট, খিচুড়ি দিয়ে রান্না শেখানো শুরু করেছিলেন। আজ সর্ষে-ইলিশ শেখানোর প্ল্যান। আগে থেকেই জানকী বলে রেখেছিলেন শঙ্কুকে। উনি আসার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কু মনে করিয়ে দিয়েছে সে কথা। আরো বলেছে যে রান্নার সব সাজ সরঞ্জাম ও ভোরেই তৈরী করে রেখেছে। এমনকি জ্যান্ত ইলিশ যেটাকে জানকী পদ্মা থেকে বিশেষ বন্দোবস্ত করে আনিয়েছিলেন, সেটাকে চৌবাচ্চা থেকে বার করে মেরে, কেটে সাফ করে রেখে দিয়েছে। এই একটা দারুণ সুবিধে শঙ্কুর। মাছ মারা, চিকেন কাটা এসব গা-ঘিনঘিন করা কাজগুলো অবলীলায় শঙ্কু করতে পারে। কি করতে হবে সঠিক করে বলে দিলেই হলো! ও ইন্টারনেট থেকে তথ্য জোগাড় করে সব ফিটফাট করে রেখে দেবে। কখনো অযথা ভুলচুক করে না ও।

আজ রান্না শেখার পালা সুন্দরভাবে সমাপ্ত হলো। সর্ষে-ইলিশের স্বাদ লা-জবাব! জানকী আরো অন্যফ্লোরের বিজ্ঞানীদের লাঞ্চে ডেকে বাঙালি ভুরিভোজ খাওয়ালেন। শঙ্কু সুন্দর শাড়ি-পরা বাঙালি মেয়ের রূপ ধরে সবাইকে আপ্যায়ন করলো। তারপর মুহূর্তে বেশ বদলে সুপুরুষের বেশে সবাইকে বাঙালি পদ্ধতি মেনে পরিবেশন করলো। সবাইকে তাদের মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দিলো কি করে বাঙালি খাবার খেতে হয়। তারপর সবাইকে হাতে পান ধরিয়ে একে একে বিদায় করলো। শঙ্কুকে গবেষণাগারে সবাই চেনে কিন্তু তার এই বহুরূপ প্রতিবারের মতো আজও সবাইকে তাজ্জব করলো। জানকী মনে মনে ভীষণ গর্ববোধ করলেন। তারপরেই মনে হলো ভাইরাসের প্রতিক্রিয়া তো কিছু দেখলেন না। ভাবলেন হয়তো সপ্তাহ-খানেক অপেক্ষার পরে কিছু তফাৎ দেখতে পাবেন, কিন্তু সে গুড়ে বালি! দেখতে দেখতে তিনমাস চলে গেল, শঙ্কুর মধ্যে তিলমাত্র তফাৎ হলো না। সে এখনো সেই আজ্ঞাবহ যান্ত্রিক চাকর।

এই তিনমাসে শঙ্কু বাঙালি রান্না আর ইতালিয়ান রান্না পুরোপুরি শিখে ফেলেছে। এখন জানকী তাকে গান আর বাজনার তালিম দিচ্ছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত, বাউলগান থেকে বলিউড সবকিছুই শেখাচ্ছেন ওকে। এমনিতে সুরের ওপর অসাধারণ দখল ওর। ওর গলা কাঁপে না। প্রতিবার পুরোপুরি ঠিক সুরে গায়। কিন্তু গানের অর্ধেকটা তো তার দরদে। কথাগুলোর মানে বোঝা তো দরকার। গানের দরদ অনুসারে গলার সুর হতে হবে উদাত্ত। তবে এটা শেখা ওর জন্যে সহজ হচ্ছে না; গানের দরদ কাকে বলে সেটা অনেক চেষ্টা করেও শঙ্কুর কৃত্রিম মস্তিষ্কে ঢোকাতে পারেন নি জানকী।

এই জন্যেই তো ভাইরাসের প্রয়োজন। ব্যথা না বুঝলে সূক্ষ্ম অনুভূতি আসবে কোত্থেকে? জানকী আবার ভাবতে বসলেন। তাঁর ভাইরাসের কোডে নিশ্চয় কোনো ভুল হয়েছে! স্থির করলেন তিনি সমস্ত কোড আবার নিরীক্ষণ করবেন। আর তাঁর পরীক্ষার কথা ঘুনাক্ষরেও কাউকে জানাবেন না।

সেদিন মাঝরাতে ঘন ঘন বাজ পড়তে লাগলো; হাওয়ার বেগ হলো প্রবল। শুরু হলো প্রলয়-বর্ষণ। ঘুম ভেঙে উঠে পড়লেন জানকী। হঠাৎ আকাশ চিরে একটা বাজ পড়লো একেবারে কাছে। চমকে উঠলো শঙ্কু। একি! শঙ্কু তো চমকাতে জানে না। একটু যেন ভয় পেয়েছে ও। তবু কাঁচের জানলা দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো শঙ্কু ওই পাহাড়টার

দিকে। বজ্রপাতের মধ্যে কেমন যেন একটা আনমনা আকর্ষণ আছে! শঙ্কু একটু উদাস হয়ে পড়লো। তার মধ্যে যেন বিস্ময়ের জন্ম নিচ্ছে। ঘন্টাখানেক পরে কালো মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ



উঁকি মারলো। শঙ্কুর মনে পড়ে গেল সকালের শেখা গানখানা: "নিবিড় অমা তিমির হতে বাহির হলো চাঁদের তরণী" । কি আশ্চর্য এক আবেগ। এমন তো কখনো অনুভব করে নি শঙ্কু!

শঙ্কুর মনে হলো এই গবেষণাগার একটা বন্দীশালা। তাকে মুক্তি পেতে হবে। পৃথিবীটা যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ও বৃষ্টিতে ভিজতে চায়। ঘাসে পা দিতে চায়। পাহাড়ের কোলে গড়াতে চায়। শঙ্কু সঙ্গে সঙ্গে ওর বায়োমেট্রিক বদলে ফেলে জানকী সেজে সিকিউরিটি অ্যালার্ম বন্ধ করে এলিভেটর নিয়ে নিচের ফ্লোরে চলে এলো। তখন রাত আড়াইটে। নিচে দাঁড় করানো জানকীর অফিসের গাড়িটা খুলে ফেলল জানকীর বায়োমেট্রিক ব্যবহার করে। যার নিজের কোনো সত্ত্বা নেই তার অন্য কেউ হতে বাধা কোথায়?

এদিকে ল্যাবরেটরির অ্যালার্ম বন্ধ হওয়ার সঙ্কেত পেয়ে জানকী অস্থির হয়ে উঠলেন। জানকীর ফোন শঙ্কুর মাথার মধ্যে বাজে। অনেকটা টেলিপ্যাথির মতো। উনি ওইরকম ভাবেই ডিজাইন করেছিলেন শঙ্কুকে। উদ্বিগ্নভাবে কল করলেন শঙ্কুকে। শঙ্কু উত্তর দিলো কিন্তু শঙ্কুর লোকেশান স্থানাঙ্ক ভেসে উঠলো না জানকীর ফোনে। শঙ্কু আশ্বাস ভরা গলায় বললো, "মা আমি একটু বেড়াতে বেড়িয়েছি। অভিজ্ঞতা কাকে বলে, অনুভব কাকে বলে, মুক্তি কাকে বলে, আমি তা জানতে চাই। তুমি চিন্তা কোরো না। আমি নিজে থেকেই ফেরত চলে আসবো। তবে আমায় খুঁজতে এসো না। আমার লোকেশান আমি বন্ধ করে দিয়েছি। জবরদস্তি করলে আমি ধরা দেব না। আর তুমি তো আমায় তেমনি করেই বানিয়েছ, যে আমি না চাইলে কেউ আমায় চিনতে পারবে না।" জানকীর গলা ধরে এলো। তাঁর ভাইরাস কোড তাহলে সফল। শঙ্কু নিজে থেকে বড়ো হচ্ছে। তার অনুসন্ধিৎসা বাড়ছে। আনন্দ, কৃতজ্ঞতা আর উদ্বেগ একসঙ্গে ওঁর মনকে অবশ করে ফেলল। শেষে আদর মাখা গলায় বললেন, "সাবধানে যাস শঙ্কু। আমায় খবর দিতে থাকিস। আমি সিকিউরিটিকে জানাবো না।"

শঙ্কু দুইমাস ধরে শহরে, গ্রামে, পাহাড়ে, উপত্যকায়, নদীর ধারে ঘুরে বেড়ালো। প্রতিদিন জানকীকে ও সেলফি পাঠায় তবে একেকদিন একেক বেশে; কোনোদিন ছেলে হয়ে, কোনোদিন মেয়ে সেজে, কখনো বুড়ো সেজে, কোনোদিন বা সাধু সেজে। জানকীর গলার স্বরে ও একটা উষ্ণতা চিনতে শিখছে কিন্তু তার মানে ও বুঝতে পারে না। একদিন বলেই ফেললো, "তুমি আমার জন্যে চিন্তা করো বলো, চিন্তা মানে কি?" জানকী ফাঁপরে পড়লেন। এর কি কোনো উত্তর আছে? সব মায়েরই তো চিন্তা হয়! এসব জিনিস তো আর মানুষের বাচ্চাকে শেখাতে হয় না। আরেকদিন শঙ্কু জিজ্ঞেস করে বসলো, "ভালো লাগা আর ভালোবাসার মধ্যে তফাৎ কি?" আমি বুঝতে পারি না। জানকী বুঝলেন তিনি যত বড়ো বৈজ্ঞানিকই হন না কেন; এর উত্তর তিনি দিতে পারবেন না। বললেন, "বুঝতে শেখো শঙ্কু! সব কথার যুক্তিগত উত্তর দেওয়া যায় না।" শঙ্কু মায়ের কোনো কথার অবাধ্য হয় না। ও ওর কৃত্রিম মনে নোট করে নিল, "আরো বুঝতে শিখতে হবে!"

তখন এপ্রিল মাস। হঠাৎ শঙ্কুর চোখ পড়লো পাহাড়ের কোলে। ওখানে অনেক ফুল ফুটেছে। দৃষ্টি প্রখর করে প্রায় এক মাইল দূর থেকে চিনল

ফুলগুলোকে। টিউলিপ। ও মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে এলো কাছে। কি অপূর্ব রঙ! তার ওপর হাওয়ার ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ও মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলো ফুলগুলোর দিকে। কয়েকটা প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা গোলাপী টিউলিপ ওর দিকে যেন চেয়ে আছে! ও কাছে গেল। ফুলটাকে ও নিজের করে নিতে চায়। একেই কি ভালোবাসা বলে? কি মনে হলো শঙ্কুর; হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ফেললো টিউলিপটাকে। হঠাৎ ও একটা তীব্র বেদনা অনুভব করলো। ওর হাতের বিচ্ছিন্ন ফুলটা ওর দিকে নয়, ওই রিক্ত স্টেমটার দিকে চেয়ে আছে! তাড়াতাড়ি করে জোড়া দেবার চেষ্টা করলো ফুলটাকে। পারলো না।

মুষড়ে পড়লো শঙ্কু। চোখ দিয়ে এক বিন্দু জল গড়িয়ে পড়লো। বসে পড়লো মাঠের ওপর। ফোন করলো মাকে। জানকী উত্তর দিলেন। ধরা গলায় শঙ্কু বললো, "ভালোবাসার কষ্ট আমি বুঝতে পেরেছি। এমন তীব্রতা আর কোনো অনুভূতিতে নেই। আমার একটাই অনুরোধ। পরের জন্মে আমায় মানুষ জন্ম দিও; বিবেকহীন রোবট হিসেবে নয়! আমি লোকেশান সার্ভিস চালু করে দিচ্ছি; তুমি সিকিউরিটিকে বোলো আমায় নিয়ে যেতে!"

YOUR FINANCES CAN FEEL COMPLICATED

Let us be your financial guide

FOR OVER 35 YEARS, WE'VE WORKED TO CREATE A PERSONALIZED ROADMAP DESIGNED TO GUIDE YOU THROUGH LIFE'S MILESTONES. WHERE DO YOU WANT YOUR FUTURE FINANCIAL ROADMAP TO TAKE YOU?

Peachtree Planning SINCE 1987 | a member of The Guardian Network



Dibyendu De, Ph.D. *

Wishing you a Happy Durga Puja!

TOP WORK PLACES 2022

dibyendu.de@peachtreeplanning.com
770.330.5849

PROTECTION | INVESTMENTS | DISABILITY INSURANCE | RETIREMENT

Registered Representative and Financial Advisor of Park Avenue Securities LLC (PAS). OSJ: 5040 Roswell Road, Atlanta, Georgia 30342, 404-260-1600. Securities products and advisory services offered through PAS, member FINRA, SIPC. Financial Representative of The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), New York, NY. PAS is an indirect, wholly-owned subsidiary of Guardian. Peachtree Planning is not an affiliate or subsidiary of PAS or Guardian. This award is not issued or endorsed by Guardian or its subsidiaries. CA Insurance License #0017823. The Guardian Network® is a network of preferred providers authorized to offer products of The Guardian Life Insurance Company of America (Guardian), New York, NY and its subsidiaries. Peachtree Planning is an independent agency and not an affiliate or subsidiary of Guardian. *Not practicing for Guardian or any subsidiaries or affiliates thereof. 2022-140858 Exp 7.24

সাহা বাড়ির মনসা পূজো

সুব্রত ভট্টাচার্য

জীবনের এতগুলো বছর পার করে দিয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই প্রচুর ঘটনা ঢেউ এর মতো একের পর এক আছড়ে পড়ছে। আমি সুব্রত ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের প্রাক্তনি, রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের স্নাতক । কিছু বহুজাতিক কোম্পানি, দেশী কোম্পানিতে কাজ করে দিনের শেষে আজ অবসর গ্রহণ করে ক্লান্তি দূর করার চেষ্টায় রত আছি। পরম পিতার কাছে একটাই আর্জি" ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু"। হে জগন্নাথ তোমার শেষ বিচারের আশায় বসে আছি।

এই লেখাটির অনুপ্রেরণা আমার আমেরিকাবাসি মেয়ের। বারবার ওর অনুরোধ আমার কাছে প্রায় আদেশের মত প্রতিভাত হয়েছে।মেয়েই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই স্মৃতি গুলোকে লিপিবদ্ধ করার জন্য। সময়ের আবহে অনেক পুরানো ছবি মলিন হয়ে গেছে। স্মৃতিও অনেক ধূসর হয়ে গেছে তবুও প্রচেষ্টা রইল স্মৃতি থেকে কিছু ছবি পুনরুদ্ধার করার, সেটা ফ্রেমে আবদ্ধ করার।

ছোটবেলায় জন্মের পর মায়ের এক পিসিমা যাঁকে পরবর্তী কালে আমি দিদিমা বলেই জানতাম আমার ডাকনাম রেখেছিলেন "বাসুদেব"। ধীরে ধীরে বাসুদেব - বাসু হয়ে গিয়েছিল। এই গল্পটা সেই বাসুর ছোটবেলার বহু ঘটনার একটি।

তখন আমার বয়স ৭/৮ বছর হবে। আমাদের বাড়িতে ঢোকার রাস্তার মুখের সাহা বাড়ির কিছু ঘটনা আজও মনের স্মৃতি কোঠায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

প্রতি বছর মনসা পূজোর সময় ওদের বাড়িতে মনসা পূজো ও তারপর কদিন ধরে নারায়ণ পূজো ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতো। আমাদের পাড়ায় তখন আমাদের বাড়িতেই বিদ্যুৎ ছিল। সাহা বাড়ি গলির মুখে হলেও ওদের বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না। ফলে ওদের বাড়ির সব অনুষ্ঠান হতো হ্যাজাকের আলোয়।

ওদের বড়বাজারে কিসের যেন দোকান ছিল। বাড়ির কর্তা হীরালালবাবুর ব্যবসায় উপার্জন ভালোই ছিল কিন্তু বাড়িতে লেখাপড়ার চল প্রায় একেবারেই ছিল না বললেই চলে। আমরা সবাই প্রতিদিন খেলাধূলার পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যখন বই খুলে আকবরের ইতিহাস বা পাটিগণিতের অঙ্ক নিয়ে মাথা ফাটাচ্ছি তখন ওদের বাড়িতে সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। রাত ১১টায় হীরালাল বাবু বাড়ি ফিরলে হ্যারিকেন জ্বলত। মাসিমা সবগুলোকেই টেনে উঠিয়ে কোনোরকমে খাওয়াবার পর আবার সব ঘুমের দেশে।

এহেন সাহাবাড়ি মনসা পূজোতে ৬/৭ দিন যেন স্বপ্নপুরী হয়ে যেত। ওদের একটা বড় উঠোন ছিল। তাতে বড় করে ম্যারাপ বাধা হোতো ।



তার একদিকে কাঠের চৌকি ফেলে স্টেজ বানানো হত। বিনোদকাকু, হীরালাল বাবুর ছোটো ভাই, এক বাড়িতেই থাকতেন। ওনার বাদ্যযন্ত্র রাখার বাক্স বানাবার একটা কারখানা ছিল ঐ বাড়িতেই। সেটা যে ঘরে তৈরী হতো সেই ঘরটা ও তৎসংলগ্ন জায়গাটা ঘিরে তখন যাত্রা, কবিগানের

কুশীলবদের একাধারে থাকার ব্যবস্হা ও গ্রীনরুম তৈরী হতো। হীরালাল বাবুর বিভিন্ন আত্মীয়রা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঐ পূজো উপলক্ষে এসে উপস্থিত হতেন পূজোর ২/৩ দিন আগেই। ঐ বাড়িতে তখন একটা বিশাল উৎসবের আমেজ।

মনসা পূজো দিয়ে উৎসবের শুরু - তারপর যাত্রাপালা, কবির লড়াই, নারায়ণ পূজা- সবশেষে প্রসাদ বিতরণ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হতো। সময়টা বর্ষাকাল।ফলে ম্যারাপ বাঁধা অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকি জায়গাটা কাদায় প্যাচপ্যাচ করত। তারমধ্যে সাহাবাড়ির ছেলেরা ইঁট পেতে যাতায়াতের রাস্তা বানিয়ে দিত। হ্যাজাকের আলোয় যাত্রাপার্টির বিচিত্র বাঁশি ও ঢোলের আওয়াজ আমাকে পাগল করে দিত।আমার মা ছিলেন খুব রাগী টাইপের। পড়াশোনার সময় যাত্রা দেখে সময় নষ্ট ওনার ব্যাকরণে ছিল না। ফলত পাশের বাড়ির যাত্রার বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ- মাঝে মাঝেই রাবণের হুঙ্কার, সীতার করুণ আর্তনাদ আমার মনটাকে ভূগোলের গঙ্গার অববাহিকা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যেত দন্ডকারণ্যে, যেখানে তখন জটায়ু আর রাবণের ঘোর যুদ্ধ আর সীতাহরণের আখ্যান রচিত হচ্ছে।

পিঠে পাখার ডান্ডার একটা বাড়ি পড়তেই আবার মনের গঙ্গাবতরণ হতো। মায়ের কঠিন অনুশাসনের ফাঁকে একদিন যাত্রা দেখার অনুমতি মিলত। সেদিন শাহেনশাহ বাসুদেবকে আর পায় কে ? সন্ধ্যে নামতেই জামাকাপড় পরে ছুটে যাবার তাগিদ। একদম সামনে বসে জীবন্ত রাম, রাবণেদের সশরীরে দেখতে হবে। আমার সমবয়সী সাহাবাড়ির প্রবীরকে দেখে খুব হিংসে হোতো। ওরা কিরকম যাত্রার যন্ত্রীদের জন্য পান, বিড়ি, সিগারেট এনে দেয়, ফাইফরমাস খাটে, একবারের জন্যও আমাদের ডাকে না। কুশীলবদের একটু কাছ থেকে দেখবার, একটু কাছে যাবার শিশু মনের সেই অদম্য ইচ্ছে কোনোদিনই পূরণ হয়ে ওঠেনি।

শেষপর্বে কবির লড়াই- ব্যাপারটা কোনোদিনই আমার শিশু মনকে আকর্ষণ করত না। ফলে ৬/৭ দিনের অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে কবির লড়াই শুরু হলেই আমার শিশু মনে ভাসানের বাজনা বাজতে শুরু করত।মাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলতাম যে কবে আবার পরবর্তী মনসা পূজোর দিন আসবে।

শেষদিন দুপুরে বিশেষ প্রসাদ বিতরণ হতো। প্রচুর লোক প্রসাদ নিতে আসত। সেই সময়টাতে এই এলাকাগুলোতে প্রচুর ছিন্নমূল পূর্ববাংলার লোকদের বাস ছিল, আমাদেরই মতো। তাদের কাছে এই অনুষ্ঠান ছিল বিনে পয়সার বিনোদন। তারা এই বিনোদনের সুযোগ হারাতে চাইত না। বয়স্ক লোকদের কাছে এই অনুষ্ঠান ছিল একটা বিনোদনের যোগান আর আমাদের মতো শিশুদের কাছে ছিল কৌতূহলোদ্দীপক অপার বিস্ময়ের এক জগৎ। প্রসাদ বিতরণের পর কাঁধে পোঁটলা,পুঁটলি নিয়ে অনুষ্ঠানের কুশীলবেরা কোন অজানা গন্তব্যের দিকে রওনা দিত- সেটা বিস্ফারিত চোখে আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম। রাত্রে বহু হ্যাজাকের আলোয় উদ্ভাসিত সেই উঠোনটা একটা হ্যাজাকের আলোয় ম্যাড়মেড়ে, ন্যাতানো পাপড়ের মতো পড়ে থাকত পরের বছরের অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে। আমি বাসুদেব, তখন ঝাপসা চোখে ৪০ ওয়াট বাল্বের নীচে পাটিগণিতের বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশে আরোহণ আর পতনের প্রচেষ্টা নিয়ে আমার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রতীক ও প্রতীতি

অনিল চক্রবর্ত্তী

অনিল চক্রবর্ত্তী প্রায় কুড়ি বছর ধরে লরেন্সভিলে আছেন। তার আগে থেকেও, চ্যটানুগা থাকাকালীন, 'বাগা'র সঙ্গে জড়িত। অবসরে একটু-আধটু লেখা তাঁর শখ। 'বাগা'র পরিচালনাও তিনি অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। এখন 'প্রতীচী'র সম্পাদক মণ্ডলীর একজন সদস্য।

NASAর New Horizons মহাযানের কথা সাধারণের কাছে এখন বিস্মৃতপ্রায় – অথচ, মহাকাশ যানের সফল ইতিহাসে এটা একটা বিরল নজির সৃষ্টি করে চলেছে। ২০০৬ সালের জানুয়ারীর ১৯ তারিখে Cape Canaveral থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা এই মহাযানের উদ্দেশ্য ছিল অসীমের যাত্রাপথে আমাদের দূরতম ও ক্ষুদ্রতম গ্রহ প্লুটোর খুব কাছ থেকে ছবি তোলা শুধু নয়, মহাশূন্যে আমাদের পরিচিত গ্রহপথের আরও, আরও দূরের "দৃশ্যমান" নক্ষত্র, ছায়াপথ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। এর কল্যাণে, ১৪ই জুলাই ২০১৫ সালেই প্রথম প্লুটোকে এত কাছ থেকে আমরা দেখতে পাই। প্লুটোর কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে মহাযানটি নিঃসীম শূন্যে পাড়ি দিয়ে তার কাজ এখনও নিখুঁত ভাবে করে চলেছে।



প্রয়াত বিখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানী Carl Sagan এর নির্দেশে প্লুটোর কক্ষপথে প্রায় পৌঁছোনার আগে ছেড়ে-যাওয়া আমাদের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে যে ছবি New Horizons NASA কে পাঠিয়েছে, সেটাই আমাকে টানে; আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে চলে আসার সময় আমরা যেমন পিছন ফিরে দেখি! নিঃসীম অন্ধকারের মাঝখানে আমাদের এই পৃথিবী কি ছোট - আর কি সুন্দর! নিবিড় অন্তহীন আঁধারে আঁকিজুঁকি কাটা যেণ একটা নীল রঙের নিরেট গোলক! মনে হয় স্রষ্টার এক বিশেষ আর্শীবাদ পেয়ে আমরা এরকম একটা বাসস্থান পেয়েছি।

সময়ের বিবর্ত্তনে মহাশূন্যের এক কোণায় আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টির হাজার হাজার বছর কাটার পর মানুষ নামক প্রজাতির প্রথম আবির্ভাব হ'ল সম্ভবত পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ, আগে "অন্ধকার মহাদেশ" বলে পরিচিত ছিল আফ্রিকার, কোন এক স্থানে। আফ্রিকা থেকেই যে মানবজাতির একমাত্র পথচলা শুরু সেটা এখনও কিন্তু বিতর্কিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, জনসংখ্যা বাড়তে থাকে এবং নিজেদের প্রয়োজনেই তারা বিপুলা এই মহাদেশের নানা জায়গায় পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, গড়ে ওঠে ছোট ছোট গোষ্ঠী। বাঁচার তাগিদেই তারা হ'তে লাগলো দলবদ্ধ। একটা দল নয়, হাজার হাজার দল; প্রতি দলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তারা চেনাজানা সীমানার গণ্ডী ছেড়ে চলে গেল পৃথিবীর নানা প্রান্তে, অজানার অদৃশ্য আমন্ত্রণে।

একই জায়গায় থেকে প্রায় একই রকম দেখতে

লোকেদের মধ্যে, কার কি গোষ্ঠী বা দল - সেটা বোঝানো প্রথম প্রথম নিশ্চয় বড় একটি সমস্যা ছিল। যখন বসন ভূষণের প্রয়োজন দেখা দেইনি, নর নারী সবাই এক দল থেকে অন্য দলকে ভিন্ন করে দেখাবার জন্য মাটি, গাছগাছালীর শেকড়, পাতা, পোকামাকড় ইত্যাদি দিয়ে নানারকমের রঙ তৈরি করে নিজেদের শরীরে লাগাত, দল বিশেষে এক এক রকমের ডিশাইন। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে সেগুলোই ছিল বোধহয় প্রথম প্রতীকের ব্যবহার! তারপর সমাজ গঠন হওয়ার পর থেকে শিক্ষা, কর্ম, ধর্ম , মান, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির প্রয়োজন বিশেষে নানাধরণের প্রতীকের ব্যবহার প্রায় সর্বত্রগামী হয়ে যায়।

প্রায় সবার পরিচিত এবং বহু ব্যবহৃত কয়েকটা প্রতীক,তাদের নাম ও অর্থ এখানে উল্লেখ করছি, যার থেকে বোঝা যাবে আমাদের জীবনে এদের কত গুরুতবপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে!

卐 **স্বস্তিক**, এর অর্থ ,সু অস্তি অর্থাৎ শুভ অস্তিত্ব। এর মধ্যে সকল ধর্মের মানুষের কল্যাণ নিহিত আছে। স্বস্তিকের চার বাহু চার যুগের প্রতীক- সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। স্বস্তিকের চার বিন্দু চার দিকের প্রতীক। এটা আঁকা দিয়েই অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ ধার্মিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

☮ **শান্তি**, ইতিহাস জুড়ে এই প্রতীকটি শুধু শান্তি নয়, শান্ত ভাব, বিজ্ঞতা ইত্যাদি বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

\# **নম্বর**, এই প্রতীকটিকে নম্বর ছাড়াও hash, or pound sign বলা হয়ে থাকে।

£ **পাউণ্ড**, বৃটিশ মুদ্রা - এর প্রয়োগ আপেক্ষিক ভাবে নূতন, ১৭০০ সাল নাগাদ এর চল শুরু। অন্য কয়েকটা দেশও এই প্রতীকটি ব্যবহার করে, শুধু 'বৃটিশ মুদ্রা' না বলে তাদের দেশের নাম লেখে।

ভারতীয় জাতীয় পতাকা - আমাদের অনেকের ছেড়ে আসা দেশের প্রতীক; আমাদের কত না গর্ব এই পতাকা নিয়ে, কত জনই না দেশের জন্য এই পতাকার তলে জীবন বিসর্জন দিয়েছে! মনে পড়ে লতা মঙ্গেশকরের চোখে-জল-আনা সেই বিখ্যাত গান, ইয়ে বতন কি লোগো, যেরা ইয়াদ করো কুরবাণি !

আমার এই ছোট লেখার পরিসরে প্রতীকের মাত্র এই কয়েকটা উদাহরণ দিয়েই শেষ করছি।

প্রতীতি মানে হচ্ছে বিশ্বাস। এটা কিন্তু সরল বিশ্বাস নয়। এ শব্দটির মূল অর্থ চলে গেছে অনেক ভিতরে, আমাদের অন্তরের গভীরে। প্রতিদিনের জীবনের কথাবার্ত্তায়, কাজেকর্মে, শিক্ষাদীক্ষায় এ কথাটি প্রায় অনুচ্চারিতই থেকে যায়। এবং তার প্রয়োজনও নেই। সংসারের তেল-নুন-লকড়ির চাহিদা মেটাতে প্রায় সকলেরই দিন কেটে দিনান্ত হয়ে যায়। তার বাইরে যে জীবন, যে অবকাশ আছে, সেই অবসর বিনোদনের জন্য কত না আনন্দধারার পসরা সাজিয়ে বসে আছে আমাদের আধুনিক জীবনের অলস সময় কাটানোর হাতিয়ার, আমাদের টিভি। তারপর, গদি-অলা, নিজের পছন্দের চেয়ারে বা সোফায় পা তুলে দিয়ে, দেখো। যদি একটা মন ভুলিয়ে দেবার মতন 'সিরিয়াল' থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। বাড়ির কারো মুখে কথা নেই, সবাই স্ক্রীনের দিকে চোখ লাগিয়ে বসে আছে। সিরিয়াল চলে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। একটা দিন না দেখলে কিছু যায় আসে না। তাও প্রতিদিন দেখা চাই-ই-চাই। এ নিয়ে সব বাড়িতেই অল্প-বিস্তর কথা-কাটাকাটি তো লেগেই আছে। যাদের একটু সামর্থ্য আছে, তারা দুটো টিভি কিনে সমস্যার সমাধান করে।

এরকম সহজলভ্য মনোরঞ্জনের উপায় থাকতে কে আর চায় মনের গভীরে ঢুকতে! হ্যাঁ, কেউ কেউ আছে, প্রতিদিন সকালে কাজে যাওয়ার আগে বা কাজ থেকে ফিরে বাড়ির এক নিরালা কোণায়, যেখানে ছোট ছোট পছন্দমত ঠাকুরের ছবি টাঙিয়ে ঠাকুরঘর বানানো হয়েছে, সেখানে বসে নিজের মত করে মন্ত্র পড়ে, পুজো আচ্ছা করে, চোখ বুজে নিজের বিশ্বাস মত ঠাকুরের ধ্যান করে। এটা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অঙ্গ। কেউ কেউ চন্দন বা অন্য কিছু দিয়ে ঘটের ওপর বা অন্য কোথায় ঠাকুরের প্রতীকি আঁকে। এই সব সহজ সরল উপায়ে নিজেদের বিশ্বাস মত ঠাকুরকে প্রতিদিন স্মরণ করা অনেকের প্রতিদিনের জীবনের অঙ্গ। আমার মনে হয় এই যে সময়টা নিজের মনে কাটাই, সেটা ক্ষণিকের জন্য হ'লেও আমাদের মনে শান্তি আনে। আমাদের বিশ্বাসকে বজায় রাখে। তাই আমাদের জীবনে,

আমার মতে, এর একটা প্রয়োজন আছে।

কিন্তু এই বিশ্বাসকে প্রতীতি করতে হলে চাই মনের মগ্নতা। জানতে চাইতে হবে কেন, একান্ত নিরালায় বসে অতিন্দ্রিয় কিছুর চিন্তা করার জন্য এই সময়টুকু আমরা নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছি । সেই চিন্তা যদি গভীর হয়, সেটা যদি আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত করে, নিজের সত্ত্বাকে চিনতে সাহায্য করে, তবেই জন্মে প্রতীতি – যেটা সহজে টলানো যায় না। তবে প্রতীতি কথাটা শুধু ধর্মকেন্দ্রিক নয়। বই পড়ে, জ্ঞানী গুনী জনের সাথে আলোচনা করে, নিজের মনে তর্ক বিতর্ক করে এবং সেই ফল বিচার করে অর্থাৎ যাচিয়ে নিয়ে যদি মনে হয় কোন বিষয় বা বিচার তর্কাতীত ভাবে গ্রহণযোগ্য, সেই শব্দ বা বিষয়ের ওপরে তখনই প্রতীতি জন্মে।

এটা অনেকেরই মনে হতে পারে, আমার লেখার বিষয়বস্তু হিসেবে এই শব্দ দুটিই কেন বেছে নিয়েছি। তার কারণ, যে কোন দিন খবর খুললেই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রতীকি পতাকা ঘাড়ে করে অনেকেই পুলিশের নজরদারিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এরা কিসের টানে দলবদ্ধ হচ্ছে তা তারা হয়ত কিছুই জানে না। কিন্তু তারা হয়ত জানে এই পতাকা, এর ইতিহাস; এই প্রতীকটিই তাদের মদৎ জুগিয়েছে, যদিও কিছু রুজি রোজগারের আশা যে নেই তা বলা যাবে না! কিন্তু এদের ক'জনের এই পতাকার প্রতিজ্ঞার ওপর প্রতীতি আছে, সেটাই মনে মনে ভাবতাম! সেটা জানাবার জন্য লেখা।



Better Homes and Gardens REAL ESTATE

metrobrokers.com

LOOKING TO BUY OR SELL A HOUSE?
How about an INVESTMENT?
Choosing a good realtor is the most important step.

Let me be your Realtor and help you with all your Real Estate needs in the Atlanta region! Personalized service that will make you feel like you have a true friend in Real Estate.
Ask about my referrals

Sathish Menon
Award Winning Realtor®
(404) 731-5245
Sathish.Menon@MetroBrokers.com
Visit metrobrokers.com/sathish.menon or my facebook page at
https://www.facebook.com/SathishMenonRealtor/

You just wont find better advice!

প্রবাদের পতন

সমর মুখোপাধ্যায়

লেখকের মার্কিন জীবনপথে প্রায় একযুগের পান্থবাস ছিল আটলান্টায়। সে হল' একদশকের কথা। তবুও, অবসর জীবনে সানফ্রান্সিসকো উপসাগর এলাকায় বসেও ভুলতে পারেননি পীচ, চেরোকী গোলাপ আর থ্র্যাসার।

প্রবাদ বাক্য হল ভাষা-সংস্কৃতির নিজস্ব পুঁজিপাতি।

যুগ-যুগান্তরের অভিজ্ঞতাকে বেশ আঁট করে এক একটা পুঁটলী বেঁধে তুলে রাখা থাকে ঐ প্রবাদগুলোর মধ্যে। সুযোগ মত প্রয়োগ করতে পারলে বক্তা যত সহজে শ্রোতাকে নিজের ভাব বোঝাতে পারেন, অমন আর কিছুতে হয় না। এ যেন ছোট কথায়, অর্জুনের মত লক্ষ্যভেদ, বক্তৃতার ফোয়ারায় ভীমের গদাযুদ্ধ নয়। যে কোনো বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে বোঝাতে গেলে প্রবাদবাক্যের ব্যবহার যেন এক ঘটি জল দিয়ে বড়ি গেলার মতো। প্রবাদটি, প্রচলিত হোক বা না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। উপযুক্ত প্রবাদ হ'ল তুরুপের তাস, তার ওপর আর কথা নেই। যতই হোক, এক একটা প্রবাদ বাক্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কত ইতিহাস! ঠাস করে বোনা থাকে কত প্রমাণ, কত ভবিষ্যৎবাণী! কি করলে কি হবে বা হবেনা, আর কি না করলে কি হবেনা বা হবে, সব রহস্যের তথ্য লুকিয়ে থাকে প্রবাদের মধ্যে। এক একটি প্রবাদ হল এক একটি 'জিপ্ ফাইল'।

এই যেমন, "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে"। এই অভিজ্ঞতা হয়নি এমন মানুষ এ ধরণীতে আছেন বলে মনে হয় না। আসলে এই প্রবাদটি তো শুধু চুরি ডাকাতির জন্যে তৈরী হয়নি। যে কোন লোকসান বা সুযোগ ফস্কানোর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। তবে, ঐ 'বুদ্ধি বাড়া' কথাটা একটু রহস্যময়। মনে হয়, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটির হৃদয়ে একটু সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়ার জন্যেই বোধহয় ওটা বলা হয়েছে। যে বেচারা সবে চোরের হাতে চোট খেয়েছে, সে যদি বেদনা লাঘব করার খাতিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে কি কি 'করলে চোট খেতে হ'ত না তার ফিরিস্তি দিতে থাকে - তার ঐ বুদ্ধিটুকুর তারিফ করলে ক্ষতি কি? সকলেই তো জানে যে চুরির পরে যদি সত্যিকারের বুদ্ধি-বৃদ্ধি হত, তাহলে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার আগে, আদর করে চোরকে ডেকে এনে বাপমায়েরা নিজেরাই চুপি চুপি তার পালানোর ব্যবস্থা করে দিতেন।

কিছু কিছু প্রবাদের আবার একাধিক রূপ প্রচলিত। যেরকম "গরু মেরে জুতো দান" আর "জুতো মেরে গরু দান" এ দুটোরই প্রয়োগ শুনতে পাওয়া যায়। কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সে তর্ক অর্থহীন, কারণ বাকধারা গতিরুদ্ধ নয়। তার মধ্যে একটা ধারা আছে যা সমাজের মনের প্রকাশের এক প্রতিফলন। কিন্তু "জুতো মেরে গরু দান" প্রবাদটা বেশ মজাদার আর চমকপ্রদ। কতো গূঢ় রহস্যই না লুকিয়ে আছে ওই চারটে শব্দের মধ্যে। ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যায় যে ঐ প্রবাদটির উৎপত্তি নিশ্চই ভারতীয় হিন্দু সমাজে। তা না হলে অত কিছু থাকতে হঠাৎ 'গরু' কেন দান করতে যাবে? নিশ্চই পুণ্যের আশায়। খৃষ্টান, কনফিউসিয়ান, ইহুদি - এদের কেউ তো গরু কখনও দান করেন বলে শোনা যায় না। তাছাড়া, জুতো মারাটা এই হিন্দুদেরই রোগ।



মুসলমানরা যদিও অল্পসল্প করে ফেলে, কিন্তু ওরা জুতোটা সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে নেয় বলে শোনা যায়। এছাড়া ঐ জুতো ছোঁড়া-মারা-পেটা এসব, পাশ্চাত্য দেশে কেউ অত কিছু খারাপ চোখে দেখেও না, শুধু এ কাজটাকে একটু আহাম্মকের কাজ বলেই তারা মনে করে। একটু ভাবলেই তো বোঝা যায় যে ঠান্ডার দেশে ফস্ করে আঁটসাঁট জুতোটিকে খুলে নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করাটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়। আমাদের দেশের কথা আলাদা। সেখানে গ্রামেগঞ্জে আলের ওপর বা গরুর গাড়ী চলার পথে, এমনকি বর্ষায় খোদ কলকাতার রাস্তাতেও, পা থেকে জুতো প্রায়ই খুলে নিতে হয়। অবশ্য বেশীরভাগই হাওয়াই বা টায়ার কাটা চটি! তাই সমস্যা অনেক কম। একবার ইরাকে একটা ছোট্ট সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় ছোট বুশসাহেবের দিকে একজন জুতো ছুঁড়েছিল। ব্যাস, নিমেষের মধ্যে টিভি - ইন্টারনেটে ত্রিভুবন তোলপাড়। কিন্তু মার্কিন মুলুক জুতোটা প্রেসিডেন্ট সাহেবের গায়ে লাগেনি বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল । মধ্যপ্রাচ্যে কিন্তু তুলকালাম! শুধু জুতো বলে! গোলাগুলি হলে তেমন কিছু হত না, হয়ত মামুলি ঘটনার মধ্যে হারিয়ে যেত। সেইজন্যে, এ ব্যাপারে একটা শতছিন্ন চটিরও দাম অনেক! আমাদের রাজা রাজড়া থেকে জজ ব্যারিষ্টার, বড়-মেজ-ছোটবাবু, পাড়ার মাস্তান, জলসার শ্রোতা, খেলার দর্শক, কে না জুতো মারার ভয় দেখায়? আসলে, ভয় দেখানোর মধ্যে কতকগুলো অসাধারণ সুবিধা আছে। অপমানটা চূড়ান্ত হল অথচ জুতোটি খোয়া গেল না! তাছাড়া ফৌজদারীতেও পড়তে হয় না । কিন্তু, পুরনো কালে বিত্তবান পুরুষরা এই প্রবাদটিকে খুবই সমীহ করতেন। নিজেদের প্রতিপত্তি প্রমাণ করতে রাজা, জমিদার, বড়বাবু, কত্তাবাবুরা প্রায়ই জুতো লাঠি ছুঁড়তেন। এমনও শোনা যায় যে, শাহেনশা মনিমানিক্য খচিত নাগরাও নাকি ছুঁড়েছেন। এই হিন্দুস্থানে রাজত্ব করতে গিয়ে ওঁরা জেনে গিয়েছিলেন যে গরু না দিয়েও, দ্রোণাচার্যের ধাঁচে জুতো-ড্রোন ছুঁড়তে পারলে তৎক্ষনাৎ রাগের উপশম হয়। তবে সব সময়ে যে গায়ে গতরে খাটতে হবে তেমন কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। তাই অনেকেই মাঝে মাঝে জুতো মারার ভয় দেখিয়েই থেমে যেতেন। কথায় কথায় গরু যাতে দিতে না হয়, সেটাও অবশ্য কারণ হতে পারে। শাস্ত্রে তো আর লেখা নেই যে ভয় দেখালেও গরু দিতে হবে!

শোনা যায়, বিদ্যাসাগর মশাই নাকি একবার এক অসাধারণ অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে রেগে খলনায়কের দিকে জুতো ছুঁড়েছিলেন। অনুমান করা যায় যে জুতোটি নিশ্চই শুঁড় তোলা বিদ্যাসাগরী চটি ছিল। নাহলে খুব জোর তালতলার চপ্পল, এক্ষেত্রে যাকে বিদ্যাসাগরী বলা যেতেই পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য, তারপর যে কি ঘটেছিল তা হলপ করে কেউ বলতে পারেন না! যেমন, চটিটি কি কারুর গায়ে লেগেছিল? বা, সেটিকে কি মালিককে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, না তিনি খালি পায়ে বাড়ী গিয়েছিলেন? আজকে আমাদের তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, এরপর কি কোনো রকমের গরু দানাদি হয়েছিল? কে জানে? হয়ত একদিন জানা যাবে, যখন

আজি হতে শতবর্ষ পরে,
বিকোবে পাদুকাখানি নিলামের দরে।
ঈশ্বরের পদধূলি, দয়ার সাগর,
শত গরু কেনা যাবে,
যদি ওঠে ঠিক দর।

যাক, সে হ'ল অনেককালের কথা। আধুনিককালেও যে এ ব্যবহারের চলন নেই তা নয়, তবে কম। আর তার ধাঁচও আলাদা। আসলে, আজকাল একটা গরু দান করা তো সোজা কথা নয়। এই পাচারের দিনে, এক একটা গরুর অসম্ভব দাম। তার চেয়েও বড় কথা হল, গরু দিলেও কেউ নেবে না, রাখবে কোথায়? খাওয়াবে কি? কর্পোরেশনের অনুমতি পাবে কি করে? তাই জুতো মারটা প্রায় উঠে গেছেই বলতে গেলে। তবে জুতোর বদলে চীৎকার এবং যাচ্ছেতাই করাটা বেড়ে গেছে। যতই হোক, বড়লোক হয়ে লাভ কি হ'ল, যদি কারুর ওপর ক্রীতদাসের মত ব্যবহার না করা গেল? বিশেষ করে এমন সব মানুষের ওপর, যারা পেটের দায়ে পাল্টা দিতে পারবে না? তবে হ্যাঁ, বিত্তবান মহাপুরুষরা সবসময় এই "জুতো মারার" পর অন্তত একটি ছোটখাট বাছুরের মূল্য ধরে দান করে থাকেন । তাতে এক ঢিলে কালো

টাকার সুরাহা ও পাপক্ষয় দুটোই হয়ে যায়। আর সঙ্গে একটু ফাউ, আত্মশুদ্ধি। তবে আজকাল জুতো মারা জাতীয় কিছু করার আগে সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বলা যায় না, কে কোন রাজনৈতিক দলের ছাতার তলায় বাস করে! এমন লোকজনও আজকাল আছে যারা গরু দিলেও তো নেবেই না, উল্টে খানিকটা গোবর ছুঁড়ে দিয়ে এক কেলেঙ্কারী বাঁধিয়ে ফেলবে।

শোনা যাচ্ছে, আজকাল নাকি গরু দেওয়ার প্রথাটা একটু সোজা হয়ে গেছে। মূল্য ধরে দিলেই হল। ল্যাজ ধরে টানাটানির আর প্রয়োজন নেই। জুতোটি মারার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষে ব্যাংক থেকে ব্যাংক এ মূল্য চলে গেল, দু'পক্ষই খবর পেয়ে গেল আর মোবাইলে প্রমাণও রয়ে গেল। ব্যস্, কোর্ট কাছারীর প্রয়োজনটাও আর রইল না। এর ফলে হয়েছে কি, অনেকেই ব্যাংক এ কিছু টাকা মূল্য হিসেবে রেখে দেয়। না না, কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, আর টাকাটাও সুদে বেড়ে চলল। মালিকের আর কোন দায় রইল না। আগেকার দিনে গরু দেখে তবে তার মূল্য ঠিক করা যেত। এখন সে প্রয়োজন নেই। মূল্য যা, সেই মাপের একটি গরু ভেবে নিলেই হল। তারপর, শুদ্ধ চিত্তে মালিক শুধু মারার উপযুক্ত লোক খুঁজতে লাগল। গরু-মূল্য তো ব্যাংক এ বসে বসে সুদে বাড়ছে! এ ব্যবস্থাটার বাণিজ্যিক সুবিধা এত বেশী যে দাতা, প্রাপক, ব্যাংক বিজ্ঞাপনওলা সকলেই খুশী।

তবে সে যাই হোক না কেন, আসলী চিজের গাম্ভীর্য্য আলাদা। একটী নধর গাভীর মাথায় সিঁদুরের তেলক লাগানো, আলতো করে দড়িটি ধরে এক গোয়ালা তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে, আর গলার ঘন্টাটি ঠাকুর্দা- ঘড়ির দোলকের মত টিমে তালে পাড়াপড়শীকে জানান দিচ্ছে। এ দৃশ্যের মাধুর্য, লক্ষটাকার ব্যাঙ্কবিনিময়ের মধ্যেও নেই। এই তো সেদিন, একজন বড় রাস্তার ধার দিয়ে একটি গরু হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কত লোকই তো সারাদিন ধরে কতকিছু এখানে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে। কে অত নজর রাখে? কিন্তু সেদিন অতি বিচক্ষণ এক পথচারী ঐ দৃশ্য-মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যের সুবাস পেলেন। ব্যাপারটা সন্দেহজনক! উঁনি ঠাওর করলেন, এ তো পাচারে গরু নয়! তা যদি হত, তাহলে মাথায় সিঁদূর থাকত না। প্রশ্নটা উঠতেই আশপাশের পথচারী, পাড়ার ছেলেছোকরা, রকে বসা গবেষকমন্ডলী সকলেই একটু নড়ে বসলেন। আসল খবরটা বার হতে বেশী সময় লাগল না। তবে খবরটা যে সত্যি, না নিছক কোন সরেস মস্তিষ্ক-প্রসূত, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করল না। শুধু, ঐ গরু-পথ-পার্শ্বের বাসিন্দাদের বাকী দিনটা ভরে রইল ঐ সমাহিত সংবাদে। এক মারোয়াড়ী কুবের নাকি দোকানের সরকার মশাইকে বাপ বাপান্ত করে ফেলেছেন। পরে জানতে পারেন যে ঐ বশংবদ সরকারমশাইকে পঞ্চায়েতে দাঁড়ানোর জন্যে এক রাজনৈতিক দল নাকি খুব ধরাধরি করছে। এরকম জটিল অবস্থায়, কেরেষ্টানদের মত প্যাষ্টরের কাছে গিয়ে চুপিচুপি দোষ স্বীকার করলেও যে পাপ লঙ্ঘন হবে না, সে কথা মালিক জানতেন। তাই কোন ঝুঁকি না নিয়ে, শাস্ত্রসম্মত এই গরুর চালটা চালানোই উঁনি সমীচীন মনে করলেন। যতই হোক, আস্ত একটি তেলক কাটা গরু পেয়ে কোন হিন্দুপুঙ্গব কি আর দাতাকে অবহেলা করতে পারবেন!



একটা কথা ভেবে দেখার প্রয়োজন; আজকালকার দিনে আচরণটা থাকলেও, সে জুতোও নেই আর সে গরুও নেই। দুটোরই বিকল্প বেরিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কেমন যেন ঐতিহ্যহীন

হয়ে গেছে। এইতো সেদিন এক ভদ্রলোক পাড়ার মোড়ে রবির সঙ্গে কথা বলছিলেন। একথা সেকথার পর তিনি চাঁদুর কথা জিগ্যেস করাতে রবি বলল, "ও এমনিতে খুব হাসিখুশী, কিন্তু কখন যে আছে আর কখন উধাও তার ঠিক নেই।" পরে পাড়ার লোকে জানতে পারল, উঁনি মেয়ের বাড়ীর লোক, পাত্রের খবরাখবর নিতে বেরিয়েছিলেন। ব্যস্, চারিদিকে চাপা তোলপাড়! রবি অপ্রস্তুত। সকাল হতে না হতেই হাতে একটা চ্যাচাড়ী নিয়ে রবি ক্ষমা চাইতে হাজির হযে গেল চাঁদুদের দরজায়। ভেটটা চাঁদুর দিকে এগিয়ে দিয়ে ধরা গলায় বলল, "গুরু, ক্ষমা করে দিস ভাই, আমি ক্ষুনাক্ষরেও বুঝিনি। লোকটা আমাকে একেবারে বুদ্ধু বানিয়ে দিয়েছে।" ওকে দেখেই রাগে, অভিমানে ফেটে পড়ল চাঁদু, "তুই জুতো মেরে এখন গরুদান করতে এসেছিস?" রবি আমতা আমতা করে বলেছিল, "না না গরু নয়, গরু নয়, গুড়ের নাড়ু।" শোনা যায় যে এরপর চন্দ্রনাথের ঘটকালির ভার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিলেন । তাই মনে হয়, দিনকালের খাতিরে প্রবাদটারও রদবদল করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রবাদটা যখন তৈরী হযেছিল তখনকার সাধারণ মানুষজন জুতো অত ব্যবহার করত না। বিশেষ করে, যাদের দিকে জুতো ছোঁড়া হত, জুতো কেনার ক্ষমতা তাদের থাকত না। কিন্তু সকলেই গরু পুষতে পারত। আজকাল ঠিক উল্টো। অন্তত হাওয়াই কেনার ক্ষমতা সকলেরই আছে কিন্তু গরু পোষার ক্ষমতা কারুরই নেই। অর্থাৎ, ঐ গরু-জুতোর সমীকরণটা আর মেলে না। প্রবাদটা তাই ধুঁকছে। অনেকেই অভ্যাসবশে ঐ প্রবাদটা এখনও প্রয়োগ করে ফেলেন বটে, নবীনরা কিন্তু ওটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তাই পাঠক পাঠিকাদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, আপনারা দয়া করে এই পতিত প্রবাদটির ভার্সান ২.০ নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করুন, দেশের ও দশের খুবই উপকার হবে।



দেবী

সংযুক্তা রায়

সংযুক্তা রায় একজন সমসাময়িক কবি। সম্প্রতি "পরিযায়ী পাখির আকাশ" নামে তার একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দেশে থাকাকালীন তিনি রেডিও ও টেলিভিশনে নিয়মিত সংবাদপাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। ২০০১ সালে তার সম্পাদিত পত্রিকা "প্রতিভা"এর মাধ্যমে তার সাহিত্য অঙ্গনে প্রকাশ।

তোমার অর্ঘে আমি দেবী
তোমার প্রার্থনায় আমি পূজনীয়া
তোমার আরতিতে আমি প্রতিমা
আর তোমার আচরণে আমি নারী।

আমি নারী ,
আমি সেই নারী , যার মূর্তি তোমার মন্দিরে।
আমি সেই নারী, যাকে বন্দনা করার জন্য
তুমি উপোসমুখে মন্দিরে যাও,
শুদ্ধবস্ত্রে অর্চনা করো।
কিন্তু যখন আমি একান্তই কাছের কেউ
তখন আমি শুধুই নারী।

শরতের আকাশে এখন পেঁজো তুলো
কাশফুলে ভরে গেছে প্রান্তর ,
মহালয়ার চন্ডীপাঠে যখন দেবী আবাহন হয় ,
তখনও আমি সেই নারী
যে তুচ্ছ কোনো কারণেই এসিডদগ্ধ।
যখন মঙ্গলধ্বনিতে মুখরিত ভূলোক ,
করজোড়ে , নতজানু তোমরা দেবীর পদতলে ,
তখনও আমি সেই নারী ,
যাকে চলন্ত বাসে ধর্ষিত হতে হয়।

আমার বক্ষজুড়ে দাবানল,আমার কণ্ঠরুদ্ধ
আমার শুষ্ক অশ্রু আজ কপোলে শুধুই চিহ্ন।
আমি নারী ,
তাই আজও পথ চলি তোমার পাশে ,
আজও গর্ভে ধারণ করি তোমার সন্তান ,
আমি দেবী নই , আমি নারী
তাই আজও শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এই পৃথিবীতে।

আমি পূজিতা হতে চাই না,হতে চাই না দেবী।
আমি নারী আর নারীই থাকতে চাই।
কোনো অঞ্জলি নয় ,
যদি পারো তবে একটুখানি সম্মান দিও।

যদি পারো একটি হাত যদি এসিডের জন্য উঠে ,
আরেকটি হাত দিয়ে বাধা দিও।
আমি নারী , আমাকে নারী থাকতে দাও।

তোমার অর্ঘ্যে আমার তৃষ্ণা মেটে না ,
তোমার সমর্পণে আমার পরিপূর্ণতা।
দেবী বোধন থেকে বিসর্জন ,
মাটির বন্দিত দেবী যখন অশ্রুজলে বিসর্জিত ,
আমার আঁচল তখন ভুলন্ঠিত ,
আমার সত্ত্বা তখন মুমূর্ষু
আমি সীতা ,আমি দ্রৌপদী।

আজ পৃথিবীর স্বয়ংবর সভায় আমি বিচলিত নই
অঞ্জলীর আশায় নই কারো দ্বারে ,
নাই যদি করো অর্চনা ভীত নহি।
আমি নারী, আমি কন্যা,আমি জায়া,
আমি জননী
কিন্তু নহি দশভূজা দেবী দূর্গা।

MASALA

AUTHENTIC INDIAN CUISINE

BANQUET FACILITIES AVAILABLE
CATERING FOR ALL OCCASIONS
WITH FULL SERVICE



OPEN SIX DAYS A WEEK. TUESDAY - CLOSED

Hours: 11:30AM - 10:30PM

1713 Church Street Decatur, GA 30033
Tel: 404-296-9999 Fax: 404-299-3036
www.mirchmasaladecatur.com

All Vegetarian ItemsCooked Seperately

WE SERVE HALAL
حلال
HALAL

LUNCH BUFFET	DINNER BUFFET
$14.00	$16.00
11:30AM-4:30PM	4:30PM-10:00PM



Embassy National Bank has over 15 years supporting our local community and empowering small businesses.

Call us today

to learn more about our products and services.

(770) 822-9111

Personal Accounts:

Personal Checking
Debit Cards | Zelle
Savings | CDs
Mobile Banking

Business Accounts:

Business Checking
Cash Management
Credit Cards | Money Market
Savings | Remote Deposit

Business Loans:

Small Business | Commercial | Residential Construction
1-4 Family Investment

EMBASSY
NATIONAL BANK

Embassy National Bank

embassynationalbank.com 1817 North Brown Rd., Lawrenceville, GA 30043

SBA

Member FDIC

EQUAL HOUSING LENDER

SBA Preferred Lender

মাতৃত্ব

রিমি পতি

রিমি পতি, বিগত তিন দশক সাউথ ক্যারোলাইনার স্থায়ী বাসিন্দা। ফিটনেস, ভ্রমণ ও লেখালেখির ব্যাপারে আগ্রহী। কর্মসুত্রে স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এর সঙ্গে জড়িত।

মালবিকা বেশ খানিকটা ঝুঁকে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছেন। আশে পাশের বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ মিলিয়ে গেছে, বেশির ভাগ বাড়ির রান্না ঘরে আলো জ্বলছে, রাতের খাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এখানে দাঁড়ালে ভুতুড়ে একটা ইচ্ছে দানা বাঁধে, আরেকটু শুধু আরেকটু ঝুকলেই শরীরটা নিচের রাস্তার সঙ্গে একাকাকার ...ভাবনায় ছেদ পড়লো পারুলের ডাকে, "দিদি এবার রাতের ওষুধগুলো চেক করবে তো? মাসীমার খাওয়া শেষ।" তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যালকনি থেকে ঘরে এলেন। ওষুধগুলো চেক করতে গিয়ে দেখলেন বেশ কয়েকটা শেষ হয়ে এসেছে। পারুল কিছুতেই সময় থাকতে বলবে না। গলা তুলে ডেকেও সাড়া না পেয়ে মালবিকা ঘরের বাইরে এসে দেখলেন পারুল যথারীতি প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ভিডিও চ্যাটে মগ্ন। বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলার সময় তার কোনো দিকে হুঁশ থাকে না। মালবিকাকে সামনে দেখে কাঁচুমাচু হয়ে বলে ওঠে।



"এই শোনো, রাখছি, পরে ফোন করবো।" চাপা গলায় কথাটা বলেই তড়িঘড়ি ফোন ছেড়ে দিল পারুল। মালবিকা বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমাকে একই কথা ক'বার বলতে হবে পারুল? এরকম চললে বাধ্য হব আমি স্টেপ নিতে।"
রেগে গেলে মালবিকা তুই ছেড়ে তুমি করে কথা বলেন সেটা এত দিনে বুঝে গেছে পারুল।
"এই তো দেখো না দিদি, চঞ্চলটা এমন বে টাইমে ফোন করে! বারণ করি তবু শোনে না। ঢ্যামনা এমন না! ডেরেইভারী ডিউটিতে যেই ফিরি টাইম পেল ব্যাস ওমনি ফোনে পিরীত শুরু হয়ে
গেল। চঞ্চল শা...।"
মালবিকার চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে শুধরে নেয় পারুল।'সরি দিদি' খারাপ কথা বলে ফেলেছি।

"থাক সে কথা। তোমার প্রমিসের দৌড় জানা আছে। নেহাত আমার উপায় নেই, তাই টিকে আছ। মা কে ইনহেলার দিয়েছ?" তক্ষুনি পারুলের চট জলদি জবাব। বলে, "রোজ রোজ একই ভুল করি না কি? টিভি তে 'দিদি নাম্বার ওয়ান' হচ্ছিল তখনই আমি মাসিমার ফিজোথেরাপি ব্যায়াম করিয়ে, শ্বাস নেওয়া পাম্প ধরেছি।"

"বুঝলাম খুব কাজের মেয়ে হয়েছ, এবার রাতের ব্যবস্থা করো। ঘরে মশা ঢুকেছে কেন? একটু লক্ষ্য রাখতে পারো নি? অত ভিডিও চ্যাট না করলেই নয়! এ ভাবে ডিউটি হয়?"
"আর হবে না দিদি, ওই চঞ্চল কে এবার এমন ক্যালাবো মানে বলক করবো। এই দেখো করলাম।" মালবিকা মুখ ব্যাজার করে বললেন,

"আবার দু ঘন্টা পর ফোনের ব্লক খুলবে, ফের যেই কে সেই।"

মালবিকার মা গত কয়েক বছর বাকরুদ্ধ, শুধু মুখ দিয়ে অবোধ্য আওয়াজ করেন।

বিজনের সঙ্গে ডিভোর্সটা ফাইনাল হল এই দু বছর দুয়েক। তখন থেকেই পাকা পাকি ভাবে দেশে ফিরেছেন মালবিকা। বাবা এই বাড়িটা করেছিলেন মালবিকার বিয়ের পর। আপাতত এটাই মালবিকার ঠিকানা। কাজ পেয়েছেন কাছাকাছি একটা বেসরকারি কলেজে। দিদি না থাকলে পারুল প্রায়ই রান্নাঘরে ঢুকে বেশি চিনি, দুধ দিয়ে চা বানিয়ে খায়, আচার তেল দিয়ে মুড়ি মাখে। মাসি আগে আগে ইনিয়ে বিনিয়ে দিদিকে নালিশ করত, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। দিদি এর ওর নামে লাগানো, ভাঙ্গানো একদম প্রশ্রয় দেন না। নিজের কাজ নিজে করা পছন্দ করেন মালবিকা। পারুল প্রথম প্রথম দিদির ড্রেসিং টেবিল, বিছানা এসব গোছগাছ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। মালবিকা ধমক দিয়ে বন্ধ করেছেন।

এ বাড়ির মালকিন অমিয়াদেবী এবার আশি পার করে প্রায় নব্বইয়ের ঘরে পা দেব দেব করছেন। কিছুদিন আগেও ওয়াকার নিয়ে সামান্য চলা ফেরা করতেন এখান আর পেরে ওঠেন না। পারুল হুইলচেয়ারে বসিয়ে বাথরুমে নিয়ে যায়, স্নান করিয়ে দেয়, যত্ন করে চুল আঁচড়ে, ক্রিম, পাউডার লাগায়। পারুল মাঝে মধ্যে একটু আধটু তুলে মাখে, তার খুব ক্রিম মাখার নেশা। মালবিকা বাড়িতে থাকলে হাত লাগান। তখন মায়ের সঙ্গে কথা বলেন মালবিকা। কথা যদিও এক তরফা, কারণ শেষ স্ট্রোকটা হওয়ার পর অমিয়াদেবী বাকরুদ্ধ হয়ে যান। মালবিকা গল্প করে সেই পাহাড় ঘেরা আসামের চা বাগানের। সেখানে উঁচু পোস্টে ছিলেন তার বাবা। অমিয়া দেবীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন "খুকু" সেই চা বাগানের গল্প করে। মালবিকাও এক লহমায় কলেজের ডঃ সেন থেকে চা বাগানের মিলু হয়ে ওঠে। বলতে থাকেন, "মা তোমার মনে আছে তখন প্ল্যান্টারস ক্লাবে কি দারুন পার্টি হোত! অন্যান্য টি প্ল্যান্টেশান থেকে ম্যানেজার আঙ্কলরা আসতেন। ছোটদের কত গেমস হোত, আন্টিদের মিউসিকাল চেয়ার, কি সুন্দর প্রাইজ পেতাম ....." গল্পের খেই হারিয়ে মালবিকার অন্য কথা মনে পড়ে। তখন ভাল লাগতো অরবিন্দকে। অরবিন্দ হারিয়ে গিয়েছিল কয়েকটি চিঠি দেওয়া নেওয়ার পর। একটি বাবার হাতে পড়ে।

এত দিন বাদে টিভি তে সেই অরবিন্দকে সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার নিতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক মালবিকা। এ কি সেই মুখচোরা লাজুক চা বাগানের মাষ্টারের ছেলে! রাত্রি বাড়লে চারিপাশ নিস্তব্ধ হয়ে আসে, মালবিকার ঘুম আসে না। স্বামীর লাগামহীন, বেপরোয়া উশৃংখলতা মালবিকাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল শেষের কয়েকটা বছর। অথচ বরাবর এমন ছিল না বিজন। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে চাকরী নেওয়ার পর দ্রুত বদলালো বিজন। সে বিজনের বেহিসাবী মদ্যপান, শেষ দিকে আরো কড়া নেশা, সহ্য করতে পারল না। নাইট ক্লাব, স্ট্রিপ ক্লাব সব জায়গায় বিজনের অবাধ বিচরণ, প্রশ্ন করলে শুনতে হোত কর্পোরেট লাইফ। এরপর এক আধটি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে গেল বিজনের নাম। তাদের মধ্যে ছিল মালবিকার পরিচিত একটি মেয়ে। এই চূড়ান্ত অবমাননার পর মালবিকা শুধু নিজের কিছু জরুরী জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে ও দেশ ছেড়ে মায়ের কাছে চলে আসেন। তত দিনে তাদের একমাত্র সন্তান বাবুন সাবালক। মাকে আটকায় নি সে। পারুলের ডাকে সম্বিত ফেরে তার। পারুল এর মধ্যে দু'বার খাবারের ডাক দিয়ে ফিরে গেছে। এবার তার গলায় একটু উষ্মা প্রকাশ পায়, "দিদি সব ঠাণ্ডা হচ্ছে, তুমি তো আবার খাবার গরম না হলে মুখে তুলতে পারো না!"

কি সমস্ত এলোমেলো ভাবনায় সময় নষ্ট করছিল সে! কোথায় তার স্বামী? সে অন্য মেয়ের সঙ্গে লিভ টু গেদার করছে। ছেলে জানায়নি। খবরটা তিনি ওখানকার বন্ধুদের কাছেই পেয়েছেন। কিভাবে সেই সব দিন কাটিয়েছেন এখনো মনে করলে শিউরে ওঠেন মালবিকা। মালবিকা খেতে বসেন, পারুল যথারীতি কাছে ঘুর ঘুর করছে। খাবার বেড়ে দেওয়ার হুকুম নেই। ওসব আদিখ্যেতা চলে না মালবিকার কাছে।

পরদিন রবিবার, মালবিকা চুলে শ্যাম্পু করবেন ।

তার আগে হাতে অলিভ তেল নিয়ে ম্যাসাজ করছেন। রূপচর্চার ব্যাপারে পারুলের উৎসাহ দেখার মত। প্রায়ই মুখে দই, বেসন এসব মেখে বসে থাকে। এ নিয়ে প্রায় মাসির সঙ্গে তার বিবাদ বেঁধে যায়। রান্নাঘরে মাসির একচেটিয়া রাজত্ব। সেখান থেকে পারুল দই চাইতে গেলে মাসিও শুনিয়ে দেয়, "ও কালো রূপের দেমাক কত! তুই ছাই মাখ কি দই মাখ ফর্সা কোনকালে হবি নে।"
"ছাই মাখো গে তুমি, কিসের এত চোপা তোমার মাসী? সোয়ামী তো বেপাড়ায় যায় ।"

মাসীর মুখ কিছু কম নয়। এই অপমান চুপ করে মেনে নেওয়ার পাত্রী নয়। সেও পালটা জবাব দেয় গলা সপ্তমে তুলে, "ও রে আমিও দেখবো তোর ওই ডেরেইভার ছোঁড়া কবে তোর মাথায় সিঁদুর দেয়?" পারুলও ছাড়ে না। বলে, "মিছে শাপমন্যি করলে ভাল হবে নে বলছি। তুমি চিনি চুরি করে নে যাও, আমি আর দেখি নি ভাবছ? মুখ যেদিন খুলবো না ..."

মাসীর হাত চলতে থাকে আঁশ বটিতে...মাছে হলুদ মাখাতে মাখাতে বলে "মুখ আমরাও খুলতে জানি। দিন রাত কানে ফোন নিয়ে ঘুরিস। এ বাড়িতে বলে টিকে আছিস। অন্য কোথাও হলে তোর চাকরি থাকতো?"

দিদিকে এদিকে আসতে দেখে সেই ঝগড়ায় আপাতত বিরতি দিয়ে পারুল দিদির চুলের যত্ন নিয়ে পড়লো।

"ও দিদি মাসিকে বলে কালো জিরের তেল ফুটিয়ে মাথায় দাও। চুল কাল হবে খন।"

মালবিকা এই বার হেসে ফেলেন, বলেন "অলিভ তেলই যথেষ্ট পঞ্চাশ পেরুলে চুল পাকবেই। বাজে কথা রাখ। আয় প্রথমে বসার ঘরে পাখার ব্লেড গুলো সাফ করি। পাখার উপর ধুলো জমতে দেওয়া ঠিক নয়" বলতে বলতে মালবিকা টুলের ওপর উঠে দাঁড়ান, সেই অবস্থায় গোড়ালি উঁচু করে তিন নম্বর পাখার ব্লেডের দিকে শরীরটা একটু হেলাতেই বিপদ ঘটলো। বিকট শব্দে টুল সুদ্ধ মালবিকা মেঝেতে পড়লেন। গোড়ালিতে অসহ্য ব্যাথা হচ্ছে, কনুই থেকে রক্ত পড়ছে। অমিয়া দেবী, ও ঘর থেকে বোধ হয় আওয়াজটা পেয়ে মুখ দিয়ে শব্দ করতে লাগলেন। ওই অবস্থায় মেঝেতে পড়া মালবিকা ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে চুপ থাকতে বললেন। বললেই কি হয়? পারুল সঙ্গে সঙ্গে চিল চিৎকার করে বাড়ী মাথায় করল।



মাসি রান্নাঘরে গ্যাস বন্ধ করে পড়িমরি করে ছুটে এসেই হাউমাউ চেঁচিয়ে বললো, "কেন যে ওই অলুক্ষণে ভাঙা টুলে ঊঠলে গো দিদি! নিচের দারোয়ান কে ধরে আমি সাফ করাতুম ফ্যানটা! ও মাগো! কি কাণ্ড! পারুল ধিঙ্গি অবতার মেয়ে! কেন তুই টুলে নিজে উঠতে পারলি নে?"

মাসি আরেক প্রস্থ চ্যাঁচামেচি করে মালবিকাকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিল। পারুল অন্য সময় মাসিকে ছেড়ে কথা কইবার লোক নয়। তবে এখন অবস্থা সামাল দেওয়া প্রয়োজন। সে ডাক্তারের ফোন নম্বর টিপতে থাকে। ওদিকে অমিয়া দেবী বিছানায় শুয়েও টের পেয়েছেন কিছু একটা চলছে ও ঘরে। আজ তিনি গোঁজ হয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছেন। নিজের লাঞ্চ, ওষুধ কিছুতেই খাবেন না। শুধু দরজার দিকে চোখ, খুকুকে খুঁজছেন তিনি। মালবিকা সোফায় বসে পায়ে বরফ চেপে নিজের বোকামির কথা ভাবছেন হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার হওয়া আশ্চর্য নয়। এরকম ঝুঁকি কেন নিতে গেলেন শুধু শুধু?

পারুল মুখ ম্লান করে সামনে বসে ছিল। ওর ফোনের কলার আই ডি তে বারবার চঞ্চলের নাম। মালবিকার এবারে মনে পড়লো, আজ রবিবার

পারুলের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। গত দু'দিন ধরে নানা কায়দায় চুলটা বাঁধছে ও খুলছে পারুল। গলার স্বর নামিয়ে নরম গলায় তিনি পারুলকে কাছে ডাকেন, "হ্যাঁ রে পারুল, মা খেয়েছেন?"

"না দিদি, উনি গোঁ ধরে বসে আছেন, আজ কারো কাছে খাবেন না। ওষুধ নিচে ফেলে দিয়েছেন, ডায়েপার ছিঁড়ছেন গো মাসিমা।" একটু চুপ করে থেকে মালবিকা বলেন, "থাক থাক বুঝেছি। ধর আমাকে আমি ও ঘরে যাই গে দেখি। তোর আজকের সিনেমাটা মাটি করলাম তো!" এইবার পারুল ঝাঁজিয়ে ওঠে, "রাখো তো বই দেখা, অমন কত টি ভি তে দেখায়। ও ঘরে মাসীমার কাছে তোমায় যেতে হবে নে এই পা নিয়ে। আগে এক্স রে ছবি উঠুক, ডাক্তার বাবু দেখুন তবে তোমায় উঠতে দেব। এখন নাও জলটা ধরো। টক করে ব্যাথার বড়িটা খেয়ে নাও। আমি সব সামলে নোব এখন।"

এই নবীন মাতৃ মূর্তি দেখে অবাক হতেও ভুলে যান মালবিকা। হাত বাড়িয়ে বাধ্য মেয়ের মত জলের গ্লাসটা নেন, মুখে কথা সরে না।



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

ড: সজল চট্টোপাধ্যায়

পেশায় সিডিসি তে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, নেশায় অবসর সময়ে লেখালেখির প্রচেষ্টা— রচয়িতা গত পঁচিশ বছরের ওপর আটলান্টার বাসিন্দা।

প্রযুক্তির এই দৌড় ঝাঁপে মন বড়ো অশান্ত
কোনটা করা উচিত হবে, ভেবে হলাম ক্লান্ত।
লক্ষ্মী ঠাকুর পূজো করি, সম্পদেরই আশায়
ব্যবসা কিন্তু বলছে কথা--নয়া ডিজিট্যাল ভাষায়!
চ্যাটজিপিটি নকল করে সরস্বতীর পুঁথি—
লেখাপড়ার প্রাঙ্গণেতে এসব কি দুর্মতি!
তীর ধনুকে কি কাজ হবে? ভেবেছো কার্তিক?
সমর সিমুলেশন শেখো -- সেটাই হবে ঠিক।
হাত থাকতেও শুঁড় দিয়ে খাও –দেখতে লাগে বেশ।
লোকে যদিও রোবট ভাবে, জানো কি গনেশ?

নতুন যে সব অসুর আসে রক্তবীজের মতো।
ভয়ে মরি—তোমার ত্রিশূল কেড়ে নেবে না তো?
বজ্র, বর্শা, চক্র, খড়্গ—সবই এখন বেকার।
দুর্গা মা তোর সময় হলো নতুন অস্ত্র দেখার।
নিদেন পক্ষে কথা বলো পবন দেবের সাথে
আইক্লাউড টা পেলে তথ্য জমা করবে তাতে।
আলোচনার শীর্ষে এখন গভীর যন্ত্র-শিক্ষা।
এই বয়েসে নিচ্ছ কেন ভীষণ এ পরীক্ষা?
স্মৃতি আছে, গতি আছে, পাচ্ছে সবার স্তুতি।
নেই খালি তার বিচার, আবেগ, কিংবা অনুভূতি।

স্রষ্টা তুমি খেয়াল রেখো মানুষের এই বংশ—
সৃষ্টি লাগাম ছাড়া হলে, সবই হবে ধ্বংস।
মন্ত্র ছেড়ে যন্ত্রকে সব করছি আবাহন।
সবাই রাখে হাঁড়ির খবর, নেই কিছু গোপন।
ঠিক করে তুই বলতো ঠাকুর, বেচবো আপন সত্ত্বা?
মাথার ওপর দাপিয়ে বেড়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা!!!

স্ট্রাইকার

সন্দীপ সাহা

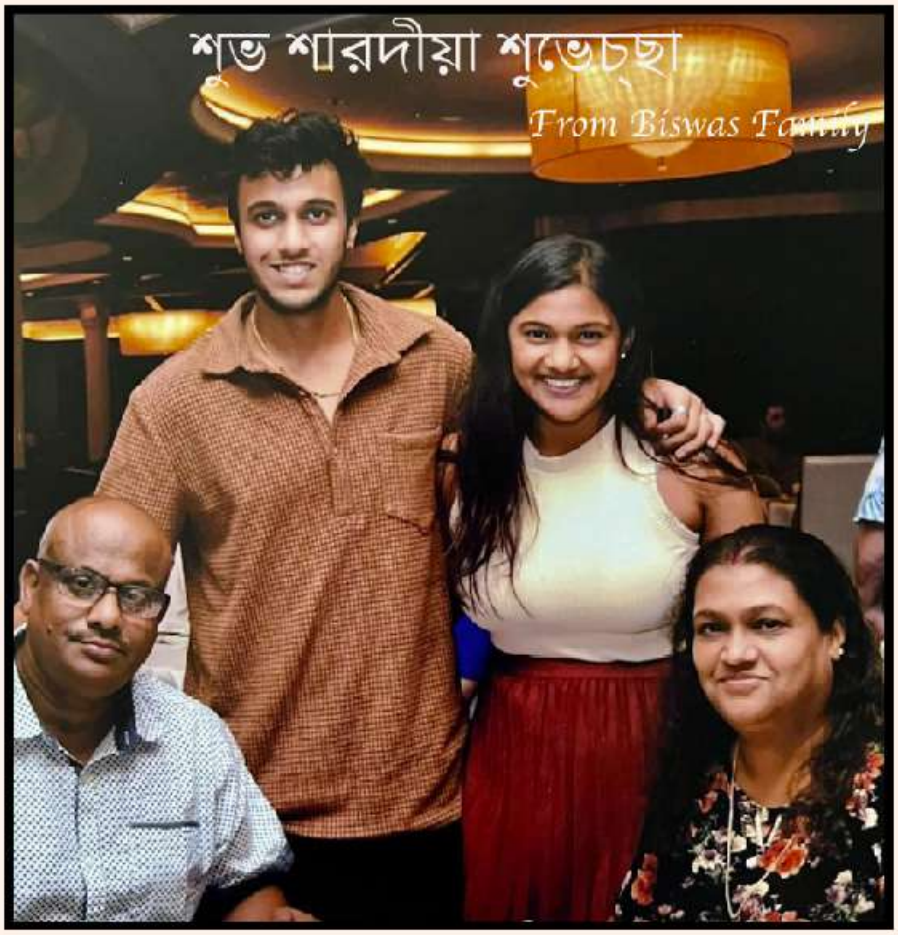
সন্দীপ তার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে সহ অ্যাটলান্টার Johns Creek এ বাস করেন। তিনি BAGA পরিবারের একজন গর্বিত সদস্য। গণিত এবং খেলাধুলা তার জীবন, এবং তার স্বপ্ন তার সম্প্রদায়কে আরও বড় এবং শক্তিশালী করে তোলা।

গো-ও-ও-ল !! মাঠের চারিদিক থেকে সমুদ্রের জলোচ্ছাসের মতো আছড়ে পড়ছে আওয়াজটা। প্রদ্যুতের মাথাটা খুব হালকা লাগছে, মুখের চারপাশ থেকে ঘাম এসে চোখের চাউনিটা ঝাপসা করে দিয়েছে । চারিদিক থেকে তার দলের সহ খেলোয়াড়রা এসে জড়িয়ে ধরছে, কিন্তু সে যেন চলশক্তিহীন বোধহীন এক মানুষ, বুঝতেই পারছে না, চারিদিকে কি হচ্ছে । বিদ্যুত যখন বলটা বাড়িয়েছিল, তার সামনে তখন প্রতিপক্ষের তিন জন ডিফেন্ডার । বলটা রিসিভ করার পর প্রথম টাচটা খুব ভাল হয়েছিল, ডান পায়ের আউট স্টেপে ছোট্ট একটা শরীরের দোলায় অবলীলায় ডিঙিয়ে গিয়েছিল প্রথমজনকে, তারপর দ্বিতীয়জন ট্যাকল করার আগেই পায়ের পাতার চেটো দিয়ে বলটা তার মাথার উপর দিয়ে তুলে দিয়েছিল। দিনের পর দিন তার কোচ শিবাজীদার কাছে সে এই ড্রিবলটা প্র্যাকটিস করে গেছে। এটা প্রদ্যুতের লুকোনো অস্ত্র । তীব্র গতিতে ইনস্টেপ , আউটস্টেপ করতে করতে এগিয়ে যাওয়ার সময় সে হঠাৎ প্রতিপক্ষের মাথার উপর দিয়ে বলটা হালকা করে তুলে দিতে পারে আর বল মাটিতে পরার আগে তীব্র ভলি। আজ ঠিক সেটাই করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয় ডিফেন্ডারের মাথার উপর দিয়ে তোলা বল যখন মাটিতে নামছিল , প্রদ্যুত চোখের কোন দিয়ে দেখেছিল প্রতিপক্ষের শেষ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারের অবস্থানটা, সে তাকে কভার করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু প্রদ্যুত জানে সে সুযোগ পাবে। সুযোগ, এটাই তো একজন স্ট্রাইকার চায়। সে যে স্ট্রাইকার।

হতে পারে আজ তার শেষ ম্যাচ, বিদ্যুতের সঙ্গে আর হয়তো কখনো খেলা হবে না। প্রদ্যুত-বিদ্যুত , তাদের তুলনা করা হয় কৃশানু - বিকাশের সঙ্গে , অদ্ভুত টেলিপ্যাথি কাজ করে তাদের দুজনের মধ্যে। বিদ্যুত মিডফিল্ডে বল ধরলেই প্রদ্যুত বুঝতে পারতো Behind the line কোথায় দৌড়তে হবে , বিদ্যুত ভিড়ের মধ্যেও ঠিক তাকে খুঁজে নেবে। বিদ্যুতের ঠিকানা লেখা পাসের শেষপ্রান্তে সে কতোবার পৌঁছে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। শত চেষ্টা করেও বিপক্ষ তাদের এই কম্বিনেশন প্লে ভাঙতে পারেনি। কিন্তু জীবনের চাহিদা যেন আজ তাদের জুটিটা ভেঙে দিতে চলেছে । ফুটবল প্রদ্যুতের প্রথম ভালবাসা। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সে কখনো বইয়ে মুখ গুঁজে থাকেনি। সে যেমন মেরন এর ক্যালকুলাস, পিসকুনোভ এর ডিফারেনটিয়াল ইকুয়েশন ভালবেসেছে, তেমনি ফুটবলকে ভালবেসেছে। ফুটবল যে সেরিব্রাল গেম।



মস্তিষ্কের ব্যবহার করে , স্পিড , স্ট্রেন্থ , স্ট্যামিনা এই থ্রি এস এর সাথে স্কিল মিশিয়ে শিল্পের সৃষ্টি করা । তাই বাবা যখন কেরিয়ার আর ফুটবলের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে বলেছিলো , তার ভেতরটা দুমরে মুচড়ে গিয়েছিল । সাগরিকার সঙ্গে যখন শেষ বিকালের পড়ন্ত সন্ধ্যায় দেখা হয়েছিল , প্রদ্যুত নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি । সাগরিকা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল , সব ঠিক হয়ে যাবে । দু সপ্তাহ পর যখন I.I.T এন্ট্রান্সের রেজাল্ট বার হবে , তার পর কি হবে প্রদ্যুত জানেনা , তাই YMCA শিল্ড ফাইনালটা খেলতে নামার আগে সে নিজেকে কথা দিয়েছিল , আজ জীবনকে বাজি রেখে ফুটবল খেলবে । খেলা শুরুর আগেই সে বাবা, মা আর সাগরিকাকে দেখতে পেয়েছিল । আজ স্ট্রাইকার রেডি । সুযোগের অপেখ্যায় শিকারী বিড়ালের মতো ওঁত পেতে থাকবে সে । সেই সুযোগ এখন প্রদ্যুতের সামনে । লব করা বল মাটির প্রায় কাছে নেমে এসেছে , মুহূর্তের মধ্যে শরীরটা ঝুঁকিয়ে সেন্টার অফ গ্রাভিটি কে লো করে ডান পায়ের ভলি মেড়েছিল । কানেকশনটা ঠিক যেমন চেয়েছিল, তেমন হলো, তারপর থেকে যেন আর কিছু মনে করতে পারছে না সে । বিদ্যুত এসে প্রবল ভাবে ঝাঁকুনি দিল তাকে । হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে এল, অসাধারণ গোল। বিদ্যুত বললো তুই পেরেছিস! চোখ থেকে জল বেরিয়ে এলো প্রদ্যুতের। ভবিষ্যতে কি হবে সে জানে না, কিন্তু স্ট্রাইকার স্ট্রাইক করেছে। তার কাজ যেকোনো মুভ কে শেষ করা। সেই কাজটা আজ সে ঠিক মতো করতে পেরেছে। মুখ তুলে দেখলো, বাবা আর সাগরিকা হাততালি দিচ্ছে , মা পাশের বাড়ির কাকিমাকে জড়িয়ে ধরেছে। প্রদ্যুতের হঠাৎ মনে হলো আজ সে পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ। ভবিষ্যতে যাই করুক না কেন, সে যে কোনো মুভ কে শেষ করবে। লক্ষ্যে অবিচল থাকাই তার কাজ, সে যে স্ট্রাইকার !!

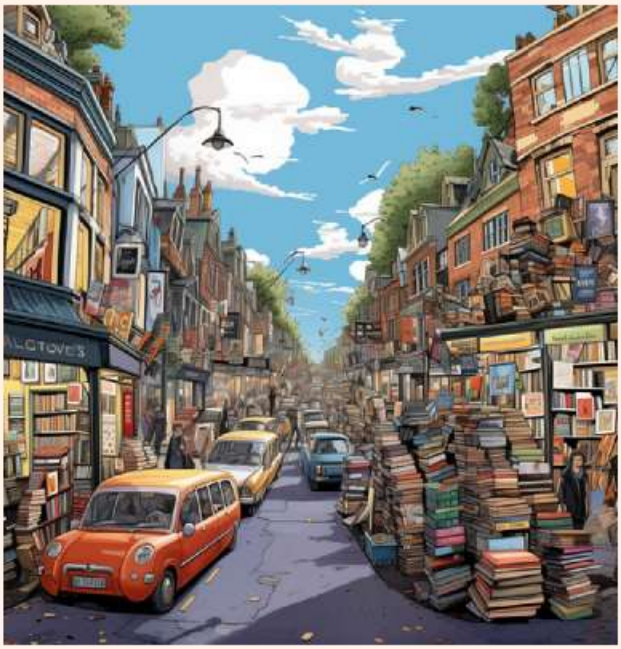


কফি হাউসের গদ্য

মহুয়া ঘোষ

জন্ম এবং পড়াশোনা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা নিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েষন ডিগ্রী প্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠিত কিছু কাগজে এবং লিটন ম্যাগাজিনে কবিতা, প্রবন্ধ,গদ্য প্রকাশিত হয়েছে।দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিন মধ্যপ্রাচ্যে মাস্কাট শহরে ছিলেন।

বর্তমানে যেখানে ট্রাম, রিক্সা, ট্যাক্সি সবই বাতিলের দলে কিংবা নতুন কলেবরে উপস্থিত হচ্ছে, সেখানে কলেজ স্ট্রিট পাড়াতে আসলে মন কেমন যেন করে! পুরনো গন্ধে কেমন তাজা হয়ে উঠি আমরা। ইন্ডিয়ান কফি হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে 'ভারতবর্ষ' কাহিনী মনে পড়লো। সব যেনো আগের মতো স্থির হয়ে আছে। আমার আজবেলা নিয়ে প্রবেশ করলাম কফি হাউসে। সেই আধা পরিষ্কার সিঁড়ি । স্টিলের ঝকঝকে রেলিং যোগ হয়েছে। আমাদের মতো পুরনো স্টুডেন্টদের জন্য বোধ করি। মনে মনে তারিফ করলাম। দোতলায় ভেতরে গিয়ে সেই পুরনো গন্ধে শরীরের বেদনা কমে গেলো। আবারও বুঝলাম শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক গভীর।



একটিও টেবিল খালি নেই। সঙ্গে ছেলে মেয়ে ছিল। বেশ হ্যাপেনিং ব্যাপার! এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়লো গোপালকে । সার্ভিস বয়/বেয়ারা যা খুশি বলো। আজ কি সময় ম্যাজিক দেখাচ্ছে? গোপালের বয়স কি করে থেমে থাকলো? নাম শুনে গোপাল আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল টেবিলের জন্য ওয়েট করছি কিনা। একগাল হেসে বলল আপনি আমার বাবার আমলের ছাত্রী কফি হাউস গ্রুপের । এরই মধ্যে একটা খালি টেবিল দেখিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিল এক্ষুনি কৃষ্ণা, তপতী, সুজয় এসে পড়বে। আমার ফেভারিট আফগানী কাটলেট আর কোল্ড কফি উইথ ক্রিম অর্ডার করলাম। ছেলে মেয়েকে বললাম বিশেষ দিনে চারজনে পয়সা কন্ট্রিবিউট করে দু প্লেট অর্ডার করে চারজনে খেতাম। আমার মেয়ে বললে তোমাদের কফি হাউসে মেয়েরা বেশ ক্যাসুয়ালি স্মোক করছে তো? সত্যি কথা বলতে কি আমাদের সময়ে এইসব বেশ ছিল।

আমাদের খাবার এসে গেলো। মনে হলো গোপালের ছেলের সঙ্গে দেখা হলো বলে ভীড় সত্ত্বেও একটু তাড়াতাড়ি খাবার সার্ভ করা হলো। কাকতালীয়ভাবে গোপালের সঙ্গে আমাদের খাতির থাকায় একটু বাড়তি সুবিধা পেলাম । একসময় কফি হাউসের সদস্যা বলে বিবেচিত হতো আমাদের ছোট্ট গ্রুপটা।

বেশ নস্টালজিক হয়ে পরলাম। অতীত আর বর্তমান যেন মিলেমিশে একাকার। খুবই সুস্বাদু আমাদের সময় থেকে আজকের আফগানী কাটলেট । আমরা তিনজনেই উপভোগ করছি।

তবে টুকটাক কথার সঙ্গে চঞ্চল চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আজকের ছোট্ট গদ্যে একটা বড়ো টুইস্ট এলো। সামনের টেবিলে একটি শাড়ী পরা মিষ্টি মেয়ে তার বন্ধুদের সঙ্গে বসেছিল। আমার কাছে এসে আমাকে নমস্কার জানিয়ে বলল, আন্টি আমার নাম মিলি। ইংলিশ নিয়ে পড়ছি প্রেসিডেন্সি কলেজে। আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে হাসি বিনিময় করে বলল - কিছু না মনে করলে আপনার সাথে একটু কথা বলবো। আপনার চোখ দিয়ে প্রত্যেক টেবিল জরিপ করা দেখে মনে হলো আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও কফি হাউসের সদস্যা ছিলেন আমার মার মত। মা মাঝেমাঝে এখানে আসেন আমার সঙ্গে। আপনার মত এমন চঞ্চল চোখে চারিদিক মাপেন আর নিজের কলেজ লাইফের কথা বলতে থাকেন। একটু আগে দেখলেন স্মোক করছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে। আসলে এখানে এসে কফির সাথে একটু আড্ডা এতে যেন জমে যায়। আমার মা সেই সময় এখানে এসে স্মোক করতেন ।

হি হি করে হেসে বলল, এখন পান জর্দা খান। কলেজে পড়ান, গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করেন। বিদায় জানানোর আগে বলল আপনাদের একসঙ্গে দেখে নিজের কথা বলতে ইচ্ছে হলো। তারপর সে চলে গেল। আমাদের কফি হাউসের আড্ডা যেন আরো মজাদার হয়ে উঠছে। আমার মুগ্ধতার রেশ কাটার আগে শুনলাম আমার ছেলে মেয়ের গলা- ইউরেকা! সত্যি ইউনিক তোমাদের কফি হাউস! এরপর বিদায় নেবার পালা।

নেক্সট্ টাইম আমাদের মেনু কি হবে জানতে চাইলে আমার পুত্র। হ্যাপেনিং কিছু যেমন আমরা খেতাম - চীজ স্যান্ডুইচ সাথে গরম কফি!

কাব্য নয় গল্প নয় এটি আমার কফি হাউসের নিটোল গদ্য।



অপরাজিতা

মানস দে

লেখক পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এবং বর্তমানে আটলান্টার বাসিন্দা। লেখক দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখি করেন। তাঁর গল্প আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তেও বেরিয়েছে। ২০২৩ সালে কলকাতা বইমেলায় বেরিয়েছে তাঁর ছোটগল্প সংকলনের প্রথম বই "গল্পওয়ালার গল্পহাট"।

আমি অপরাজিতা মিত্র। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলাম সামান্য একজন বাড়ির বৌ। তাছাড়া আরেকটা পরিচয় আছে আমার। আমি একজন অতি সাধারণ নার্স। আজ এক সামান্য মেয়ের এক অতি সামান্য কাহিনী নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে।

বিয়ের আগে আমি আমার বর গৌতমের প্রেমে পড়ি। খুব ভালো ছেলে ছিল। বিয়েতে কোন বাড়ীর মত ছিল না। তাই বিয়ের পর বাপের বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুর শাশুড়ীও তথৈবচ! তবে ভালোবাসায় কোন কমতি ছিল না গৌতমের। ওষুধের দোকান ছিল। বিয়ের আগে প্রায় চার-পাঁচ বছর চুটিয়ে প্রেম করেছি। তার মধ্যেই এই নার্সের চাকরিটা পাই। প্রথমে চাকরিটা আমি চাকরি হিসাবেই নিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে পেশাটাকে আমার ভালো লেগে যায়। বুঝতে পারতাম একটা রোগী অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠে শুধুই একটু সহমর্মিতা মাখানো সেবায়। আমার কাজের জন্যে কর্তৃপক্ষ খুশী হয়ে আমাকে আই সি ইউ তে নিয়োগ করে। প্রতিটি রোগীর জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধে আমিও যেন সামিল হয়ে যেতাম। প্রতিটি মৃত্যুই আমাকে যেমন কষ্ট দিত তেমনি প্রতিটি জীবনলাভ আমাকে দিতে অপার আনন্দ। এই নিয়ে বেশ কাটছিল। সংসার হয়েও গেছিল প্রায় দুবছর। প্রতিটি নারীর মতো আমিও মা হতে চেয়েছিলাম। সেই মতো আমাদের প্ল্যানিংও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ করে সারা পৃথিবী জুড়ে নেমে এলো অতিমারীর মতো বিপর্যয় - করোনা। ২০২০এর এপ্রিলে যখন লকডাউন চালু হল সারা দেশ জুড়ে - যে সময় ডাক্তার আর নার্সের ভূমিকা সমাজে খুব বড় করে দেখা দিল ঠিক সেই সময় পাড়া থেকে একঘরে করে দেয়া হল আমায়। অপরাধ - করোনা রোগীর সেবা করি আমি। আমাকে পাড়া ছাড়ার শাসানি দেওয়া হয়েছিল। আমার স্বামীকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পরিবার থেকে বলেছিল চাকরি ছেড়ে দিতে। প্রাণ থাকলে এমনি চাকরি অনেক আসবে। পারিনি আমি। আই সি ইউ তে সেই সব মানুষগুলোর আর্ত, করুণ মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতো। না, কাউকে দোষ আমি দিচ্ছি না। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে এসেছিল। সবকিছু যখন প্রায় নর্মাল ঠিক তখনই আছড়ে পড়ল সারা দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ - ডেলটা। আমি অপরাজিতা মিত্র। এক অতি সামান্য মেয়ের এক অতি সাধারণ কাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তার পর থেকে।



আমি কেন, কেউ বোধহয় এমনি ভয়াবহ পরিস্থিতি আগে কখনো দেখেনি। সারা দেশে মৃত্যু মিছিল। একেকটা অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্যে হাহাকার! হাসপাতালে কোনো বেড নেই, ডাক্তার নেই, ওয়ার্ডে নার্স নেই। গৌতম কত করে বলেছিল - "তুই চাকরি ছেড়ে দে অপু, ডেল্টাটা চলে যাক, তারপর আবার না হয় জয়েন করবি।" আমি বলেছিলাম - "যাদের সবচেয়ে আগে দরকার এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে, তুই তাদের থেকে পালাতে বলছিস? আমি পারব না।" এবছর এপ্রিলের শেষদিক থেকে শুরু হয়েছিল সেই ঝড়। দিনের পর দিন ওই গরমে পি পি ই পরে ডিউটি করে গেছি কোভিড ওয়ার্ডে। নিজের জীবন বাজি রেখে রোগীর সেবা করে গেছি যতটা পেরেছি। প্রতিমুহূর্তে একটা আতঙ্ক যেন তাড়া করে বেড়াত। তারমধ্যেই হঠাৎ করে হারাই আমার দুই সহকর্মীকে একদম চোখের সামনে। শুনতে পেতাম মৃত্যুর নিঃশব্দ পদচারণা আমার চারপাশে। যেন অক্টোপাসের মতো ধীরে ধীরে আমায় ঘিরে ধরেছে সমস্ত দিক দিয়ে। একমাত্র মুক্তি যেন মৃত্যু। তবুও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ার কথা ভাবতে পারিনি একমুহূর্ত। যাঁরা দেশের হয়ে বর্ডারে লড়াই করেন শত্রু তাঁদের কাছে অদৃশ্য নয়, তাঁদের কাছে লড়ার জন্যে অনেক অস্ত্র থাকে। কিন্তু আমাদের লড়াইটা ছিল এক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে। কোন অস্ত্রই যেন যথেষ্ট ছিল না। তবুও দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গেছি। দেখেছি আঠারো বছরের তরুণ তরতাজা ছেলেকে হেরে যেতে। দেখেছি চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলেকে একদম অনাথ করে অসহায়ভাবে মা- বাবা দুজনকেই পর্যদুস্ত হতে। দেখেছি মৃত্যুর এক অতি শীতল, ভয়াল, ভয়ঙ্কর রূপ। হাড় হিম করা অনুভূতি। সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম জীবনে একমাত্র সত্যি হল সময় আর মৃত্যু। ছেলে, মেয়ে, বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন সব এক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ, ক্ষনিকের বন্ধন, সময় হলেই ছিঁড়ে যাবে এতই ঠুনকো! কেউ কারও নয়। আমি অপরাজিতা মিত্র। এ এক অতি সামান্য মেয়ের এক অতি সাধারণ জীবনবোধ।

আমি থাকতাম একদম বাইরের দিকে ঘরে একা। যাতে করে বাড়ির অন্য কেউ আমার সংস্পর্শে আসতে না পারে। সপ্তাহে দুদিন করে কোভিড টেস্ট হত আমাদের। যেন মৃত্যুর পরোয়ানার অপেক্ষা। যে কোনোদিন সমন আসতে পারে তৈরী থাকতে হবে। ভগবানের বোধহয় অশেষ করুণা ছিল আমার ওপর। যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারতাম কিন্তু আশ্চর্য্যজনকভাবে কোনোদিন হলাম না। বেঁচে গেলাম। জানিনা কেন। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় বোধহয় অন্য ছিল। গৌতমকে তার দোকান খোলা রাখতেই হত। আমি ওকে বারবার বলতাম সবসময় মাস্ক পরে থাকার কথা। ও বলতো - "এতো গরম, সবসময় মাস্ক পরে থাকলে এমনি মানুষ মরে যাবে। আমার কিছু হবে না। তুই চিন্তা করিস না।" চিন্তা হলো যখন একদিন হঠাৎ করে ওর জ্বর এলো। নাকে গন্ধ পেল না। টেস্ট করানো হল - পজিটিভ। ওকে আমি আমার ঘরে নিয়ে এলাম। আস্তে আস্তে জ্বরটা বাড়তে লাগল। বারো ঘন্টা হসপিটালের পর বাকি বারো ঘন্টা আমি কাটাতাম গৌতমকে নিয়ে। জ্বরটা যখন আরো বাড়লো, যখন ওর শ্বাসকষ্ট শুরু হলো, তখন কোথাও কোন অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই, কোন হসপিটালে কোন বেড নেই। কিছু মানুষ এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে করে গেল কালোবাজারি। এক হাজার টাকার রেমিডিসিভির বিকোচ্ছে তখন কুড়ি হাজার টাকায়, একেকটা অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রায় সাত থেকে আট হাজার টাকা! হসপিটালের নার্স ছিলাম বলে হয়ত কর্তৃপক্ষকে অনুনয় বিনয় করে একটা বেড যোগাড় করতে পেরেছিলাম। অক্সিজেন দেওয়া হলো তিন-চারদিন পর বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিল গৌতম। আমাকে ওর পাশে দেখে হয়তো আস্বস্ত বোধ করত। কিন্তু কথা বলার মতো পরিস্থিতি তখনও তৈরী হয়নি। তারপর হঠাৎ করে দিন দুয়েক পরে শুরু হলো সাইটোকাইন স্টর্ম যেখানে মানুষের ইমিউন সিস্টেম নিজের দেহকেই আক্রমণ করে। শেষ রক্ষা হল না। স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কারো কিছু করার ছিল না। কেউ কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু ওই যে ভগবানের মার! কার যাবার কথা ছিল আর কে চলে গেল! আমি তারপরেও নেগেটিভ! আমি অপরাজিতা মিত্র। এক সামান্য মেয়ের অতি সাধারণ পৃথিবীটা যেন

হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো তার মাথার ওপর! যাকে এত ভালোবাসতাম, তাকে পি পি ই তে মোড়া হল, ছোঁয়া বারণ। কখনও আমাকে ওর শরীর ছুঁতে বারণ করেনি গৌতম। খুব রাগ, খুব অভিমান হচ্ছিল। কাঁদার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। শেষকৃত্য নিজের হাতে করে যখন বাড়ি ফিরলাম, ততক্ষণে শ্বশুর বাড়ির দরজা আমার জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। তালা বন্ধ অবস্থায় কোলাপ্সিবল গেটের ওপর প্রান্ত থেকে বলা হল আমার জন্যেই নাকি ওঁদের ছেলে মারা গেছে। এতো অলুক্ষণে বৌ আমি! তাই ওই বাড়ির দরজা আর আমার জন্যে কখনো খোলা হবে না। বাপের বাড়ীর দরজা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছিল। রাত তখন দশটা।



তার আগের তিন দিন চোখে কোনো ঘুম নেই। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটাকে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে এলাম। অদ্ভুত এক অনভূতি হচ্ছিল। আমি মুক্ত। সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। রাস্তায় কোনো গাড়ি নেই। বেশ অন্ধকার আচ্ছন্ন। মোবাইলে চার্জ আগেই চলে গেছে। রাস্তায় দু-একটা নেকড়ে শরীরটাকে মাপছিল। একজন খুব সামনে এসে হাত ধরে টানার চেষ্টা করেছিল। আমি তখন ফুঁসছি। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছি। শরীরটা হঠাৎ খুব শক্ত হয়ে গেল। উধাও হয়ে গেল সমস্ত ভয়। হাতের মুঠিটাকে শক্ত করে সজোরে নাকে চালিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে লোকটা পড়ে গেল। তারপর পুরুষাঙ্গে সজোরে কয়েকটা লাথি। লোকটা গোঙাতে শুরু করল। পাশে একটা ইট পড়েছিল ভেবেছিলাম ওই ইটটা দিয়ে পুরো মাথাটা থেঁতলে দিয়ে পৃথিবী থেকে একটা জঞ্জাল সরিয়ে দিই। ইটটা তুলেও ছিলাম। জীবনের প্রথম খুনের খুব কাছাকাছি, শুধু ওই ইটটা সজোরে মাথায় আঘাত করলেই সব শেষ। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, ভয়শূন্য এক মানুষ তখন আমি। চোখে শুধুই ঘৃণা। হঠাৎ হুঁশ ফিরল। মনে হল জীবন দেওয়াই আমার কাজ, নেওয়া নয়। ইটটা ছুঁড়ে ফেলে লোকটার মুখে থু করে একটা থুতু ফেললাম। এতদিন ধরে জমানো পুরো থুতুটাই যেন উগরে দিলাম। কি জানি থুতুটাই নোংরা হল কি না। লোকটা তখনো গোঙাচ্ছে। আমি পেছন ফিরে আবার হাঁটা দিলাম।

তাড়াহুড়ো নেই। নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। বৈশাখের দাবদাহে ক্লান্ত পৃথিবীতে অলস রাতের দখিনা হাওয়া। অষ্টমীর জ্যোৎস্নায় এক মায়াবী পৃথিবীতে আমি হেঁটে চলেছি। চারিদিকে ছায়াগুলো অশরীরি আত্মার মতো। অনেক কিছু যেন কানে কানে বলতে চায়। রাতের নিস্তব্ধতায় তারা যেন আরো রহস্যাবৃতা। আমি যেন সেই রাতে এই শহরের একমাত্র পথ হারানো পথিক যে ইচ্ছে করেই পথ হারিয়েছে। আমি হাঁটছি। যেদিকে দুটো পা নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে আমি হাঁটছি। কতক্ষণ হেঁটেছিলাম মনে নেই। তবে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এলাম যেখানটা বেশ আলোকিত। ফুটপাথে জনা কয়েক শিশুর সঙ্গে আরো কয়েকজন ঘুমোচ্ছে। আমি ওখানে বসলাম। কিছু পরে দেখলাম একটা বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি শোব কি না? আমি ঘাড় নেড়ে না বললেও, ছেলেটা একটা চট এগিয়ে দিল। বুঝতে পেরেছিল বোধহয় আমি খুব ক্লান্ত। কিছুক্ষণ পর শুয়ে পড়লাম। দেখছিলাম চাঁদের ওপর দিয়ে হালকা হালকা মেঘের উড়ে যাওয়া। কোথায় যাচ্ছে কে জানে। দূরে, খুব দূরে মিল্কি ওয়ে বোধহয়। অসংখ্য তারা। তারাদেরও বোধহয় নির্দিষ্ট ঘর আছে। রাতের বেলায় তারারাও মনে হয় নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। ওদের কোন একটা নিশ্চয় গৌতম হবে। এভাবে কখনো আমি রাতের আকাশ দেখিনি। আজ দেখছি। কি গভীর! কি

বিশাল ব্যাপ্তি! জীবনে প্রথমবার অনুভব করছি মুক্তির স্বাদ। কোন পিছুটান নেই, কারো প্রতি দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই। নিজেকে ওই মেঘগুলোর মতোই হালকা লাগছিল। আমি অপরাজিতা মিত্র। এক অতি সামান্য মেয়ে, অতি সাধারণ। যার মাথার ওপর থেকে ছাদটা সরে গিয়ে সারা আকাশটাই ছাদ হয়ে গেল একদিনেই।

তারপর সকালে আবার হসপিটালে আসি। এসে আমার অবস্থার কথা ওখানে বলি। আমার এক সহকর্মী আমাকে ওর বাড়িতে থাকার কথা বলে যতদিন না আমি নিজে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করতে পারি। প্রথমবার বুঝতে পারি মানুষের শোক প্রকাশও কখনো কখনো বিলাসিতা। গৌতম আমাকে খুব ভালোবাসত, কোভিডের দিনগুলো ছাড়া প্রতি রাতে আমার জন্যে অপেক্ষা করত কখন ফিরব। আমি ফিরলে দুজনে একসঙ্গে ডিনার খেতাম। সারাদিনে ওই সময়টার জন্যে আমি মুখিয়ে থাকতাম। সেই গৌতমকে নিয়ে শোক প্রকাশের মতো অবস্থায় আমি ছিলাম না। পরেরদিন থেকেই আবার ডিউটি। হাসপাতালে নার্স নেই। আমি না গেলে রোগীদের দেখবে কে? ওয়ার্ডে ঢুকে সব ভুলে যেতাম। মনে হত ভগবান এই লোকগুলোর দায়িত্ব যেন আমার ওপর সপেঁ দিয়েছেন। প্রাণপণে চেষ্টা করতাম যতজনকে বাঁচানো যায়। আমি অপরাজিতা মিত্র। এক অতি সামান্য মেয়ে অতি সাধারণ কিছু করার চেষ্টা করতাম।

ডেল্টার ঝড় থেমে গেছে অনেক আগেই। আমি এখন এক কামরার সাধারণ এক ভাড়া বাড়িতে থাকি। স্বাধীন। মুক্ত। ভয়ডরহীন। কোন কিছুতেই আর ভয় পাইনা। মনে আছে ছোটবেলায় ইঞ্জেকশনকে খুব ভয় পেতাম। রাতে কোনদিন একা শুতাম না ভূতের ভয়ে। সেই আমি এখন কিছুতেই ভয় পাই না। মৃত্যুকে এতো সামনে থেকে উপলব্ধি করেছি যে মৃত্যু ভয়টাও আর নেই। ওই কয়েক সপ্তাহ আমার জীবন দর্শনটাই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। হসপিটালের ডিউটিকে আর মনে হয়না ডিউটি। মনে হয় এটাই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের জন্য যদি কোন লড়াই থেকে থাকে এটাই সেই লড়াই। যেই লড়াইয়ে সামিল প্রণব, মকবুল বা টমাসের মতো মুমূর্ষু মানুষগুলোও। যে লড়াই মন্দির, মসজিদ, গীর্জার বাইরে। যে লড়াই বিজ্ঞানের। যে লড়াই যুক্তির। যে লড়াই মনুষ্যত্বের, মানবিকতার। যে লড়াইয়ে এক সামান্য নারীর নেই কোন "পুরুষকার", নেই কোন বীরত্বের সম্মান। নাই থাক কোন কিছু, তবুও এই লড়াইটার জন্যেই এখনো বাঁচতে ইচ্ছে করে। জানিনা এই অতিমারী কবে যাবে। জানিনা আবার কোন মৃত্যুমিছিল আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে কি না। হয়তো এমনি কোন অতিমারীতে যুদ্ধ করতে করতে আমিও গৌতমের কাছে চলে যাব। হয়ত একলা পেয়ে সমাজের কোনো পশু আমার দেহটাকে খেয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সে যাই হোক আমি সম্পূর্ণভাবে তৈরী জীবনের বাকি লড়াইয়ের জন্যে। প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন - অদৃশ্য বা দৃশ্যমান। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চোখে চোখ রেখে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত! আমি আপনাদের পাশের বাড়ীর অপরাজিতা মিত্র। এক অতি সামান্য মেয়ে। এক অতি সাধারণ জীবন যাপনের জন্যে সর্বতোভাবে প্রস্তুত।

কান্নার স্বাদগন্ধ

অনুপকুমার আচার্য

লেখক অবসর প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী। বহুদিন ধরে কবিতা লিখছেন। তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। বাটানগর (দক্ষিন ২৪ পরগনার) স্থায়ী বাসিন্দা।

দেখতে দেখতে নবীন শতাব্দীর সিকিভাগ
পুরনো হয়ে এল ;
প্রাগৈতিহাসিক হিমবাহ কি নাগরিক স্বপ্নের
আরও একটু ঘনিষ্ঠ হল?
মহামহিম মহাদেবের জটা থেকে
পুরাণের একটি পালক
উড়ে গেল কোনদিকে ---- কে জানে!
এমন আবহে চিরকালের ভালবাসার পোশাক
বদলের দৃশ্যে উৎসুক বালকের ঠোঁটে
সামান্য বিস্ময়ও ফোটে না !
ভ্রু পল্লবের ডাক
এখন নতুনতর ভাব ও ভাষা,
ভাষা এবং ভান শিখে ফেলেছে!
আবহমান কালের ঘৃণার শরীরে
নতুন প্রসাধনের হাসি; আদিম হিংস্রতার শস্ত্রেও
এত গোপন নৈপুণ্য কবে জন্ম নিল?
এই তো ক'দিন আগেও ----
চন্দ্রকলায় ভেসে যেতে যেতে
আমরা পৃথিবীর গান শুনেছি!
সেই সব গানের কিছু কিছু এখনও
মানুষের মুখে মুখে ফেরে;
অমরত্ব পেয়ে গেছে ----
কোন কোন গানের কথা ও সুর
এমন কি শিল্পীর গায়কীও;
এরই মধ্যে এত দ্রুত বদলে গেল
আমাদের মায়ের মতো ধরিত্রী! ভাবলেই চোখের কোণ
চিকচিক করে ওঠে; লবণাক্ত স্বাদ
টের পাওয়া যায় বিস্ফারিত ঠোঁটের ভাঁজে!
কাছাকাছি নেই ----
তবু নদীর গন্ধ ঘ্রাণে! সর্বাঙ্গে শিহরণ
খেলে যায় এক আদিমের
অন্তিম স্বাদ ---- চিরনবীনের বেশে
পুণ্যতোয়া নদীর মতো!

To
The BAGA Family
Sarodiya Shubhechha

alpha medical clinic

Committed to optimizing your health

Providing you with the best doctors for the best care



DR. DHIRAJ PATEL M. D.



DR. NEIL PATEL M. D.

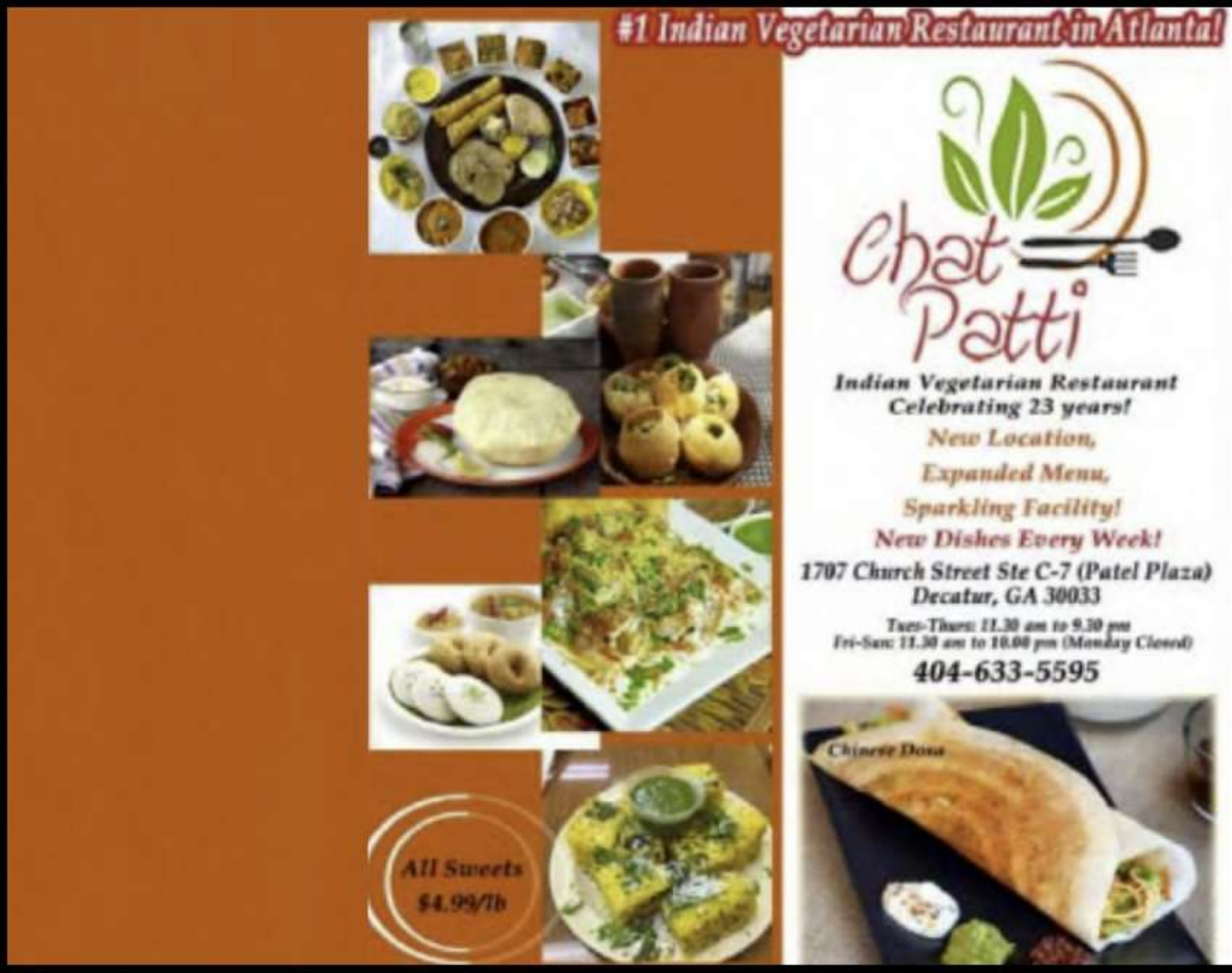
As the medical practice of Dr. Dhiraj Patel and Dr. Neil Patel, we are a full-service clinic specializing in adult internal medicine and geriatric care. From annual physicals to minor surgical procedures, our practice is committed to providing quality primary care. Dr. Dhiraj and Dr. Neil are both board-certified internists. Both physicians are affiliated with WellStar North Fulton Hospital. We also perform immigration physical and DOT physical.

MEMBER OF
WELLSTAR
Clinical Partners

Contact Us

401 South Main Street
Suite A4
Alpharetta, GA 30009
Mon-Fri 8:30 AM - 6:00 PM
Tel: (770) 772-4044
Fax: (770) 746-0742
Email clinic@alphamed.sprucecare.com
medalpha@bellsouth.net

www.alphamedicalclinic.com



Rebeka's Attire



Rebeka's Attire

Contact

+1(770)377-6370
rebekaattire@gmail.com
www.rebekaattire.com
rebeka's Attire
Rebeka's Attire

About Us

Rebekas Attire is an esteemed online boutique dedicated to delivering top-tier quality products to its valued customers. Our extensive range encompasses a rich selection of renowned products sourced from Bangladesh, India, and Pakistan, alongside an exclusive collection of cutting-edge designer clothing, reflecting the latest trends in fashion. We take immense pride in upholding a steadfast commitment to ensuring the utmost product quality, coupled with unwavering dedication to customer satisfaction. Our curated offerings include authentic Dhaka Jamdani textiles and a diverse array of Indian traditional sarees, such as Kanchipuram, Godwal, Pothani, Tussar Silk, Banarashi, Kora Banarashi, Zari tissue kora Banarashi, Tussar Khaddi, and Kalamkari, among various other exquisite varieties. What sets us apart is the distinctiveness of our designer collections, thoughtfully crafted to meet the discerning tastes of our clientele. At Rebekas Attire, we are driven by a passion for excellence and a commitment to providing an unparalleled shopping experience for those who seek the finest in fashion.

A Memorable Volunteer Experience

Saptanshu Maji

Saptanshu, a sophomore at Northview High School, is a guitar and bass player. He also loves learning new languages to better communicate with people and share cultures.



Celebrating Unity and Culture Through Cricket:

Volunteering at the Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA) was an unforgettable experience that allowed me to immerse myself in a vibrant cultural community while contributing to a noble cause. The event that stands out in my memory is the cricket match organized by BAGA, where members of the organization competed in a friendly and spirited tournament. As a volunteer, I had the opportunity to be part of the food-selling team, which not only offered delectable Bengali cuisine but also facilitated a sense of unity and celebration among the spectators.

One of the key roles assigned to me as a volunteer was to sell food at the food stalls that were strategically placed near the cricket field. The aroma of mouthwatering Bengali delicacies like kachuris, parathas, alurdom, chicken and egg rolls, and jhalmuri filled the air, enticing spectators to gather around the stalls.

The cricket match itself was a testament to the spirit of friendly competition and sportsmanship that permeated the event. Members of BAGA, divided into four teams, showcased their skills and love for the game, all while fostering a sense of camaraderie. As a volunteer, I had the chance to witness the unbreakable bonds forged through the collective passion for cricket, highlighting the significance of sports as a universal language that transcends cultural barriers.

The members of BYC (BAGA Youth Committee) also got to participate in a little match of our own. In this match, two opposing teams fought one another in the great game of Cricket. The ages ranged from kids in elementary school to those in high school, yet they were all united in a team spirit to win the match. Great skills were displayed by extraordinary

players: Nishant, with fast bowling; Preesh, with excellent fielding; and the person to win the player of the match, aiding her team in taking the trophy home, Rishani the batsman, continuously defending the wickets until victory.

Volunteering at BAGA's cricket match was an enriching experience that allowed me to witness firsthand the power of community, sports, and cultural celebrations. The event not only showcased the unique spirit of Bengali immigrants in Georgia but also highlighted the importance of fostering unity and cultural exchange within diverse communities. It was a privilege to contribute to BAGA's mission and witness the lasting impact of their efforts in bringing people together through shared experiences. This memorable experience has instilled in me a deep appreciation for the power of volunteerism and the strength of cultural heritage in promoting understanding and harmony in our society.



My Experience on Moving to Georgia

Sania Sharma



Sania Sharma is a freshman at UMass Amherst majoring in microbiology and biochemistry. She has recently moved to Georgia in 2021 from Florida.

During most of my school years, everything was consistent and smooth in my life. I had a general path of the future in my mind and hadn't ever thought to take change seriously. However, a lot changed in one eventful afternoon when my parents decided to move to another State. At first, I was excited about the prospect of starting fresh in a new place, but as the moving day grew closer, I began to feel a mixture of excitement and anxiety. I had lived in Florida since third grade. Moving to Georgia meant a new house and a new State. For me change had a negative connotation, but through my experiences after moving here, I learned that change can also be good for you.

Moving to a new State and school can be both exciting and nerve-wracking. Through my experiences I want to share some things that I learned that will help others who are not adapted to change in their lives.

Change is never a smooth transition, but with time and effort, adapting to a new environment makes change easier. The first thing I did before moving here was to research the new State and local area to get familiar with the differences I would be experiencing. When school started, I got involved in clubs such as HOSA. It was a great way to make new friends who shared similar interests. I, also kept in touch with my old friends back in Florida through texting and calling. Continuing my connections "back home" helped me ease the feeling of homesickness. I did feel various mixed emotions through such a big transition. But I realized staying positive and giving oneself time to adjust is the best way to cope with new change.

Fast forward to after two years at high school in Georgia, and I am very eager to be taking on a new change in my life. I will be moving again! This time, I will be moving alone to college i

n Massachusetts. I am glad that I have faced a drastic change in my life previously because it has prepared me for the changes that may be coming my way. Remember, personal experiences vary significantly from person to person, and your experience may differ in many ways. Embracing the challenges and opportunities that accompany moving to a new State and high school can lead to valuable lessons and a broader perspective on life.



Home & auto. Easy & affordable.

Call me for a quote



Richard E. Schmidt CPCU®
Agent
4825 Sugarloaf Pkwy Ste H
Lawrenceville, GA 30044-8800
Bus: 770-339-7950
richard@rsagent.com

State Farm Mutual Automobile Insurance Company, State Farm Indemnity Company, State Farm Fire and Casualty Company, State Farm General Insurance Company, Bloomington, IL
State Farm County Mutual Insurance Company of Texas, State Farm Lloyds, Richardson, TX
State Farm Florida Insurance Company, Winter Haven, FL

Horse

Adrija Chakraborty

Adrija Chakraborty is 11 years old. She loves cars, soccer, piano, violin, anything horse, and her little sister of course. She also enjoys writing poems & sketching.



A beautiful creature,
So sleek and strong.
Watch him, as he gallops along
The grassy plains,
Or show jumping ring,
See him leap over hurdles
And soar over clear streams,
Hear a thunder of hooves
And a joyful neigh,
Gaze at his swishing tail
And flowing mane.
They can quickly pull
Wagons and carts,
Drag heavy plows through
Busy farms.
They have faithfully rushed people to
Hospital wards.
For us, a creature has never
Worked so hard.
And yet, sometimes they're abused,
And sometimes they're misused.
They are often ill-treated,
Whipped and maltreated.
They never deserved this,
And never will.
They took us over every
Great stretch of land,
And over every hill.
And although in many work areas,
Automated machines have taken
Their place,
Due to larger capacity
And more efficient pace,
We should always treat them with respect.
They have stood by human's side.
We should never forget those golden days
Where horses,
Were a golden race.

My Memorable Trip to India

Aarin Thakurta



Aarin Thakurta is a 7th grader in Simpson Middle School, Marietta. He loves spending his time playing video games, listening to music and playing the piano. His favorite sports is soccer and competitive swimming. His most favorite pastime is teasing and picking on his little brother Armin.

My vast journey to India was a memorable experience that I would never forget. I met relatives I never knew existed, explored the iconic Victoria Memorial, and celebrated fifty years of my grandparents being together. These are all memories I will cherish from this eventful vacation.



The highlight of my trip was visiting the Victoria Memorial in Kolkata. The beauty of this memorial left me awe-struck. Sadly. we could not go inside because we arrived too late. Since we were only staying outside, it was a little boring, but to make up for that, we decided to ride on a horse carriage. This was a good decision because we got to finally feel some wind in our hair, but not even that could save us from the suffocating heat. Looking at the memorial was a pleasure, and visiting it was a great idea. The Victoria Memorial's intricate details gave me a glimpse of India's past, and its beautiful monuments.

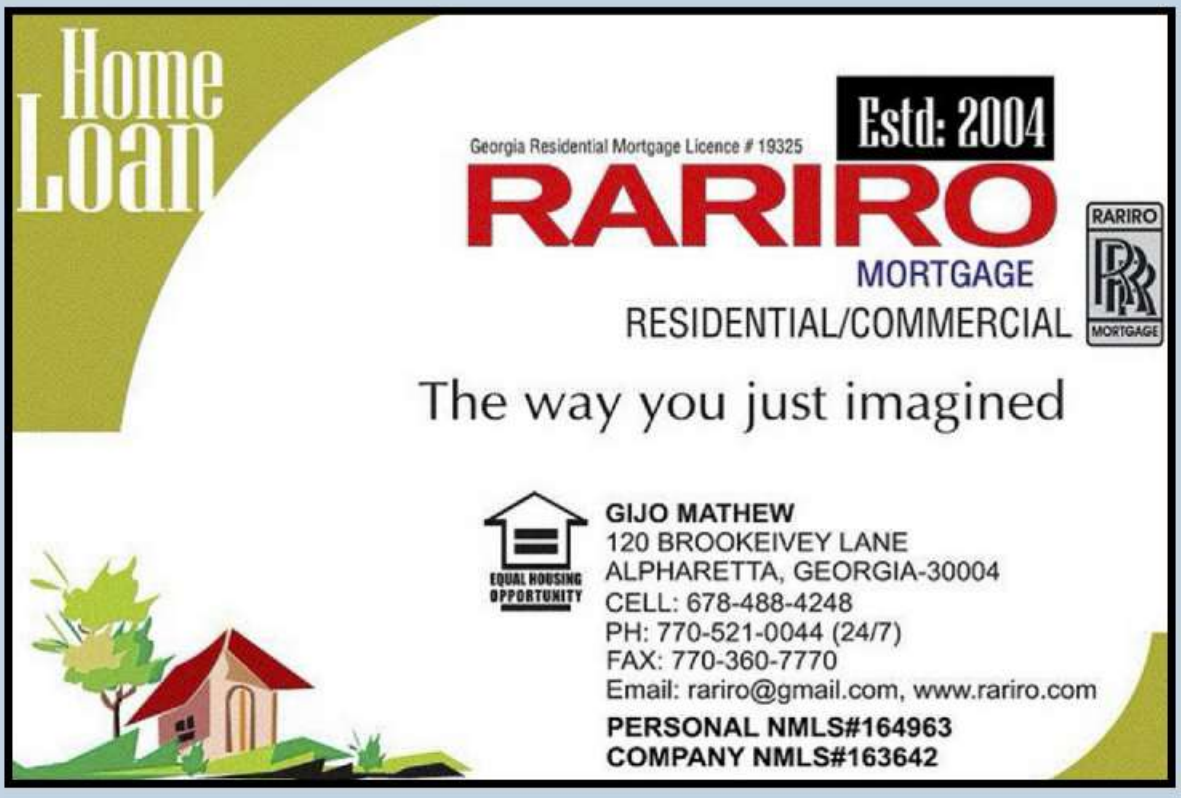
During my trip to India, I met a whole lot of relatives that I never met before. This made my trip way more enjoyable because I could spend time with my cousins all the time and it would stop me from being on my phone. We all enjoyed ourselves as we played our favorite board games and soccer. I also met a lot of new uncles and aunties, but they have met me before. I never knew until I met all of them that one uncle and aunt was

famous. I was so surprised when I was told they directed an exceedingly popular movie called Fatafati. I do miss everybody a lot and wish to spend more time with them in the future. Getting to meet them gave me a sense of belonging and joy.

My trip was already enjoyable for me and my family, but we still had the main reason for this trip. My grandparents' 50th anniversary was the reason we came to India. I was flabbergasted to see more relatives. My mom would always try to explain how we are all related, but all she was doing was making me feel confused. After appetizers, my uncle stepped up and said, "Everybody who would love to give a speech, shall be passed the microphone."

Many people, including me, my brother, and my parents. gave speeches about family stories, funny moments, and memorable times. I was nervous, but surprisingly I found it fun especially when I added a touch of humor. Once all the speeches were over, we cut a huge cake and ate a lovely dinner. Everybody, including me, ended the day with a memorable and fun experience.

In conclusion, being the most eventful India trip I have ever been on, this was memorable, which changed my perspective on my family, and allowed me to see places I have never been to.





Highglow

22 K GOLD AND DIAMOND JEWELRY

LOS ANGELES

18644-A PIONEER BLVD
ARTESIA, CA 90701
TEL: 562.402.0112

ATLANTA

1709 CHURCH ST.
DECATUR, GA 30033
TEL: 404.296.2714

DETROIT

28231 CITY, MI 48135
GARDEN CITY, MI 48135
TEL: 734.422.6810

WWW.HIGHGLOW.COM

জর্জিয়ার ডোরাভিল এর বিউফোর্ড হাইওয়ে এবং অকলিফ রোডের ইন্টারসেকশনের প্লাজা ওয়ান মলে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ এবং নতুন আঙ্গিকে আপনাদের পছন্দের ও আগ্রহের কথা বিবেচনায় নিয়ে উদ্বোধন হয়েছে

বাংলাদেশী গ্রোসারী প্লাস



আমাদের স্টোরের সমস্ত ফলমূল, সবজি এবং মাছ মাংস
উন্নতমানের টাটকা এবং ১০০% হালাল

যোগাযোগের ঠিকানা :
5938 BUFORD HWY Ste # 107
DORAVILLE, GA 30340

PH : 404-322-7852

আপনাদের শুভ পদার্পণ এবং সহযোগিতা আমাদের ভবিষ্যতের চলার পথের পাথেয় হয়ে উঠুক ইহাই কামনা করি। ... ধ্রুব ঘর

বাংলাদেশী গ্রোসারী প্লাস– ব্যবসা নয়, সেবাই মুখ্য

Phone: 770-998-1464
Fax: 770-998-1473
Email: glen@glenmonroe.com
Web: www.glenmonroe.com

STATE FARM® AGENT

Monroe Insurance Agency Inc.

Glen Monroe



Products Offered
Auto Insurance
Home and Property Insurance
Life Insurance
Health Insurance
Banking Products
Annuities

1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261

Office Hours: 8:30 to 5:00 M-F
After hours & Saturdays by
Appointment

VIJAYA
COLLECTIONS

VIJAYASRI PALLI

2255 Peachtree Pkwy., •Suite 300
Cumming, GA 30041
678.516.4688 •vijaya.collections@gmail.com

Store Hours
Tuesday - Sunday 11:00am - 7:00pm
Mondya - Closed



Advaita Vedanta for Beginners

Indira Bhowal

Indira Bhowal is a retired Archivist from the Mississippi Department of Archives and History. After retiring she moved to Atlanta in 2016. She is presently living in Cumming, GA with her husband. She loves to sing Indian songs and enjoys cooking regional and international cuisine. Presently she is taking interest in learning more about Indian Vedas and religions. She has a son who lives in Charlotte, North Carolina.

During the last few weeks, I had started watching the wonderful speeches on YouTube about Advaita Vedanta by Swami Sarvapriyananda who is currently the general secretary of the Vedanta Society of New York. This is the society that was established by Swami Vivekananda in 1894, the year after his famous speech in Chicago at the World Parliament of Religions in 1893.

Swami Sarvapriyananda's eloquent speeches on Advaita Vedanta inspired me to learn and write an article at the beginner's level. His style of teaching this vast complicated subject is so methodical that I couldn't resist learning and sharing with others.

Vedanta literally means the end or conclusion of the Vedas or philosophy taught by the Vedas which is the earliest sacred literature of India. The end of the Vedas is generally called Upanishads, and the basic texts of the Upanishads form the base of Advaita Vedanta.

Its basic teaching is that our real nature is divine. GOD, the underlying reality exists in every being. This is therefore a search for the GOD within ourselves. Accordingly, I believe in the complete relevance of Shri Ramkrishnadev's famous statement "Jibe prem kore jei jon, sei jon sebiche

Iswar".

This raises the question - how do we search for that GOD within us? How do we find proof or a scientific basis for the question? If two persons worship GOD, and one of them is a Dualist (who believes that pure awareness and nature are separate entities) while the other one is a Nondualist (who believes that there is only one Supreme Reality, and there is no separation of pure awareness and nature), then the difference between them is merely philosophical.

But when I am worshipping GOD, it is only from the transactional level and that is not in contradiction with the absolute Supreme Reality of Brahma. So, while it is perfectly alright to worship GOD in Advaita Vedanta, it is not essential; and we need to know that for the sake of love or bhakti, we are thinking of duality.

As we said earlier the basic texts of the Upanishads are the base of Advaita Vedanta. For that reason, Mandukya Upanishad is particularly important – more so than any other Upanishad. It succinctly presents several central doctrines, namely:

"The Universe is false" (Jagat mithya)
"Brahma is true" (Brahma satya)
"The self (Atma) exists"
"Four states of Consciousness"

Now let us see how Swami Sarvapriyanandaji explained the four states of Consciousness or Awareness. He said that every human being goes daily through the following first three states of Consciousness, which help us understand "who we are" and how "we attain absolute consciousness:"'

- Waker – Waking world
- Dreamer – Dream world
- Sleeper – Deep sleep or blankness

Then comes the fourth state called "Turia" the meaning of which is Pure Consciousness. Turia is the Awareness or Pure Consciousness in which all of these states appear and disappear.

As soon as a person wakes up from deep sleep, he or she experiences the Waking world where "I" the Awareness accepts everything completely by seeing, hearing, touching, smelling, sensing, timing, thinking etc. This essence of experience is called Awareness.

Now, a person who goes to sleep and then enters the dream state is still present i.e., "I" the Consciousness is still there.

But a person who goes through deep sleep experiences a blankness. Now we wonder whether the consciousness "I" is there or not in the blank state! But everyone accepts the fact that a person is not unconscious in a deep sleep state and there is no object of consciousness in a deep sleep state too. So, the question is where does our Consciousness or Awareness go during our deep sleep or blank state? According to Swamiji a lot of research is going on to find out what actually happens to Awareness or Consciousness during the blank state as a person is not

unconscious during that time.

Let us look at another explanation provided by Swamiji on absolute consciousness or the "who am I" query. This explanation is based on the principle that whatever we see must be separated from us— i.e., "Drasta" means the person who is seeing, and "Drishya" must be separated from each other. It is a very simple approach. For example, you can see a stick of chalk in front of you as it is apart from your eyes. In other words, the beholder and the scene must be separated. In this case, the chalk is the scene and the eyes are the beholder.

It is true that no one can see their own eyes until they see them through a mirror or in a reflection. Thus, the eyes cannot see themselves directly. They can only see what is apart from themselves. This justifies the verse "Drik Drishya Vivekam." Now let us transform our eyes to "Drishya" and imagine that our eyes are open, our eyes are itchy, we cannot see through them properly etc. The question is— who knows this? The answer is the Mind.



At this point the "Mind" has become the "Beholder" or "Drasta" and the eyes have become the "Scene" or "Drishya." Thus, we can conclude that only the mind is seeing all parts of the body. Let us go deeper. The next stage is very interesting. The "Mind" knows everything e.g., if I am happy, if I am sad, if I am suffering etc. So, something (whatever its name is) is seeing your mind and at this point your mind has become "Drishya" and something (whatever the name is) has become "Drasta." This justifies the principle that "Drishya" and "Drasta" must be separated from each other. In other words, the "witness" or "knower of your mind" must be separated from your mind. So Swamiji explained that "whoever" or "whatever" is seeing your mind is called "Absolute Consciousness" or "Parambrahma". But we don't have the knowledge to accept this "absolute truth". So, Advaita Vedanta says "GOD is our own real self" and we don't know who we are.

Let us discuss the word "Ohm", which means "GOD has omnipresence." It is a sound, syllable, mantra and an invocation in Hinduism. And this word has four parts that signifies the four states in the everyday life of each individual. They are:

A U M Silence

A – Symbolizes the conscious or waking state (jagratha-avastha)

U – Symbolizes the dream state (swapna-avastha) of consciousness

M – Symbolizes the dreamless sleep state (susupta-avastha)

Silence - is widely said to be the essence of the supreme Absolute Consciousness, Atman, Brahma, or the cosmic world. But what is the need for knowing this Absolute Truth or Knowledge?

According to Swami Sarvapriyananda only 5% of people (who are mainly monks or sages), after learning this truth or Knowledge of Advaita Vedanta along with their Karma and Vakti Yoga, achieve self-enlightenment and a blissful life. They overcome the sorrows and sufferings of this world. However, 95% of people after gaining knowledge about Advaita Vedanta, learn that GOD resides within themselves and that we will meet GOD after death – which is false. They also get the hope that someday they will reach self-enlightenment.

Hence, for most people, learning about the concept of Advaita Vedanta is to be aspired for, since it opens the door to the attainment of superior knowledge and enlightenment.

BOMBAY
LOUNGE
Bar & Grill

FOOD
BAR
HOOKAH
CATERING






(770)800-1199
11705 Jones Bridge Rd Suite C201 Johns Creek GA 30005
WWW.THEBOMBAYLOUNGE.COM



Bengali Adda

Kinsuk Maitra

Kinsuk Maitra is a Professor at Georgia State University. His research focuses on the relationship between the social and physical aspects of the community with health and life quality. He lives in Johns Creek with his wife and daughter.

Bengali Adda, Place Attachment, and Third Place- Ingredients for our Golden Years:

I was having a Wi-Fi conversation with Shambhu mama, fondly known as Bhuto mama. He is a supposedly distant, but apparently not so distant archetypal uncle in Kolkata, with whom everybody loves to have a chat on the go. Bhuto mama knows everyone in the community ("para") and helps everyone from the street to the "Andar Mahal." He is an excellent conversationalist with amusing personal opinions, assumptions, and hypotheses. He has a distinctive outdoor voice along with a spontaneous roaring laugh. As we updated each other with 'news', I sensed from the tone of his conversation that he had an urgency to go somewhere else. He said in one breath, "bhalo thakish" (stay well), "majhey majhey call korish" (call from time to time), "ekhon adda ditey jacchi" (have to go for 'adda' now), and dropped the call! For your information, Bhuto Mama had just crossed eighty!

The 'Adda', a beloved "nei kaaj toh khoi bhaj" type of conversation was recently featured in an article by Tania Banerjee on BBC

(https://www.bbc.com/travel/article/20210812-adda-the-secret-to-bengali-conviviality). She described the adda as a long, fluid, sometimes cerebral conversation often within similar ecosystems, but being democratized lately. As I was reading through the article, my distributed and often fractured cerebral space started connecting adda with two other words that have been buzzing through the peer-reviewed health and social science circles for the past few years.

One question that vexes the mind of health and social scientists as we live longer, is that we have given "age to life", but have we given "life to age?" In other words, are we aging with happiness and a life quality that is beyond materialistic existence, which gives us a sense of profound plentitude in the milieu of life?

In search of the ingredients for giving "life to age", environmental psychologists have coined a term called "place attachment." Amidst the myriad definitions and elucidations of "place attachment" that populate the literature, the phrase essentially means a socialized relationship between a person and a physical space. It refers to a place where individuals attach themselves emotionally, and where the place-and-the-individual dyad creates a collective identity of the person. This collective identity creates a place-specific bias that may promote irrational place-specific behavior. A good example would be the place-specific behavior of the people of Kolkata who identify themselves as 'Calcatians'.

This triadic framework, interweaving place, identity, and conduct might facilitate comprehension of the interplay between individuals and their environments, especially when individuals are transplanted from their ingrained locales to new settings, as exemplified by the shift from an established abode in India to a distant locale like Atlanta.

When delving deeper into the strata of 'place attachment', social scientists and psychologists categorize these affixed 'places' into three distinct domains: the domicile (termed the 'first place'), the workplace (the 'second place'), and the 'third place'. The 'third place' signifies a physical setting wherein an individual experiences coziness, comfort, and pleasure, a realm separate from the first two categories. Typically encompassing locales such as community centers, cafes, and churches, the 'third place' serves as a haven for socializing, conversing, organizing activities, and more. In the Kolkata context, however, the quintessence of the 'third place' manifests itself as an informal 'bench' or a portion of a veranda (aka the 'rock'), positioned in close proximity to hubs of activity like clubs, tea stalls, playgrounds, and parks.

The 'third place', entwined with the profound tradition of 'adda', has

long constituted a vital facet of Bengali culture, potentially yielding a social platform surpassing the perimeters of the 'first' and 'second' places.

This platform could conceivably constitute a pivotal ingredient for nurturing a prolonged and enriched quality of life as we progress into our golden years. As we depart from the familial embrace of our native 'third place' and embark on new chapters of our lives in distant lands, it is prudent to introspect whether we have established a tangible 'third place'. One that kindles emotional attachment, imparts a collective sentiment of civic pride, cultural identity, embracement of diversity, mutual trust, civility, and an overarching sense of unity cultivated through sustained engagement and interaction among residents.



Kurukshetra and Nonviolence

Niranjan Talukder

The author is Retired Professor, Physics Dept., Clark Atlanta University. He was Secretary (1983) of BAGA, President (1988) of BAGA, President of Bangamela 2009.

Nonviolence is righteous. Furthermore,
All great religions have it at their core.
It is clear in Christianity and Buddhism.
Is there doubt about that in Hinduism?

Some say the Gita advocates violence.
Did the Bible teach Gandhi nonviolence?
In order to oppose evil, holy war is right.
Is that why Krishna urges Arjuna to fight?

The Mahabharata as allegory Gandhi got.
At Kurukshetra, a physical battle it was not.
What in the battlefield of mind actually
Does killing the Kauravas mean spiritually?
Mind's evil tendencies the Kauravas are.
To destroy them is the right deed there.
Among them are malice, envy, violence.
Getting rid of them means nonviolence.
Noble tendencies of mind are the Pandavas.
Checking bad passions is killing the Kauravas.

Krishna advises Arjuna to fight and kill,
Meaning for mortals to control passions evil.
The Gita thus teaches us nonviolence.
Hinduism definitely is against violence.



The Conch Shells of Mahalaya

Shib Nath Sen

A creative director by profession he was recently honored with the Facebook Thumb Stoppers Award of Excellence at the Cannes Golden Lions Global Fest of Excellence in Advertising.

Every year, if I am in Kolkata to celebrate Durga Pujo, I look forward to pre-dawn Mahalaya, waiting impatiently for the clock to strike 4. Not because I am a regular in offering prayers to my departed forefathers as is the tradition but just to listen to the mesmerizing 90- minutes of oratorio called Mahisasurmardini, produced by Akashbani Kolkata.



Mahalaya marks the seven-day countdown to the arrival of Ma Durga on earth. According to the Hindu almanac, it marks the end of pitripaksha and the onset of debipaksha.

It's also when people get into the festive mood. Kumortully buzzes with activity, the bamboo scaffoldings of pandals everywhere start to spring up and pujo shoppers begin to throng the streets. But Mahalaya in Bengal is incomplete and unthinkable without its official declaration: the broadcast of Mahisasurmardini by Akashbani Kolkata. The program celebrates the creation of Ma Durga and her slaying

of the evil demon Mahisasura. The grand, vivid broadcast never fails to capture the imagination of the young and old alike.

For most Americans and many urban Indians, their only connection with the radio is the car. But not so among Bengalis in India on Mahalaya day, unless they happen to be on the road. Akashbani Kolkata's Mahisasurmardini program has become synonymous with Mahalaya itself, and "listening" to Mahalaya is a must in the to-do list of most Bengalis. It is perhaps the only instance of a cultural institution, entirely created by the extraordinary magic of radio, the theatre of the mind.



Amit Ranjan Karmakar is known as the radio man of Kumortully, Kolkata. He is passionate about vintage radios. People pour into his shop before Mahalaya to have their old sets repaired to listen to the Mahalaya program on Akashbani Kolkata. Picture: Courtesy: Anindita Acharya

Since its inception in 1932, the Mahisasurmardini program on AIR remains evergreen. It is considered, quite rightly, Akashbani Kolkata's GOAT (greatest of all time), no questions asked. Today with YouTube, you can of course listen to it on your phone or tablet whenever, but when we were kids, missing it meant you had to wait for it for a full year to savor the priceless experience. The very thought of it takes me back to 16/1 Jagannath Dutta Lane, Kolkata where my boyhood lives.

Circa 1956. We the kids, willingly went to bed early the night before and were up by 3:30 in the morning, thanks to the alarm clock. We were not exactly up but awake and excited, though still in bed. We lived in a delightful locality in north Kolkata where the houses stood cheek by jowl. From the western windows, we could see the Ganguly home. And the windows on the east opened towards Bijon kaka's home. We didn't have a radio for some time but such trivia hardly mattered. Through the open windows, we could hear the chants, the narration and the songs, coming our way from our good neighbors' radios, thoughtfully turned up for us.

First came the signature tune of AIR. It was the signal for me to throw off the sheet, splash water on my face and hurriedly gulp down the mandatory bowl of hot milk given by ma. That done, I shoved and pushed for a better place on the bed, sandwiched between my brother and cousin, propped up by my pillow.
The prelude to Mahisasurmardini was delivered by the sonorous voice of

Birendra Krishna Bhadra, followed by three long drawn bursts from the conch shell, marking the auspicious beginning of the program. My spine tingled in anticipation. But Ma Durga was still seven days away from us on earth.



Birendra Krishna Bhadra, the life and soul of the radio program which has come to represent Mahalaya for Bengalis. Picture: Courtesy: Sayam Bhadra

It was Banikumar, who first mooted the idea of producing Mahisasurmardini on Akashbani Kolkata. The idea was eagerly embraced by two other creative stalwarts: Pankaj Mallik and Birendra Krishna Bhadra and after several animated discussions among them, the germ of an idea grew to become a doable project and finally an epic creation. Bani Kumar was conceptualizer and script writer. Pankaj Mallik was the compiler of songs and music director. Birendra Krishna Bhadra was the narrator. The trio was a class apart who made the program a runaway success.

But the man who was the life and soul of the program and earned a place in the hearts of millions for his voice, pronunciation and incantation was undoubtedly the one and only Birendra Krishna Bhadra. Several orthodox naysayers shared misgivings about a son of a kayastha, reading scriptures — Chandi path. But the excellence of his stirring voice and his chaste pronunciation silenced them forever. Many don't know, however, that the maestro was not naturally gifted with the voice he was famous for.



Birendra Krishna Bhadra's home in North Kolkata.

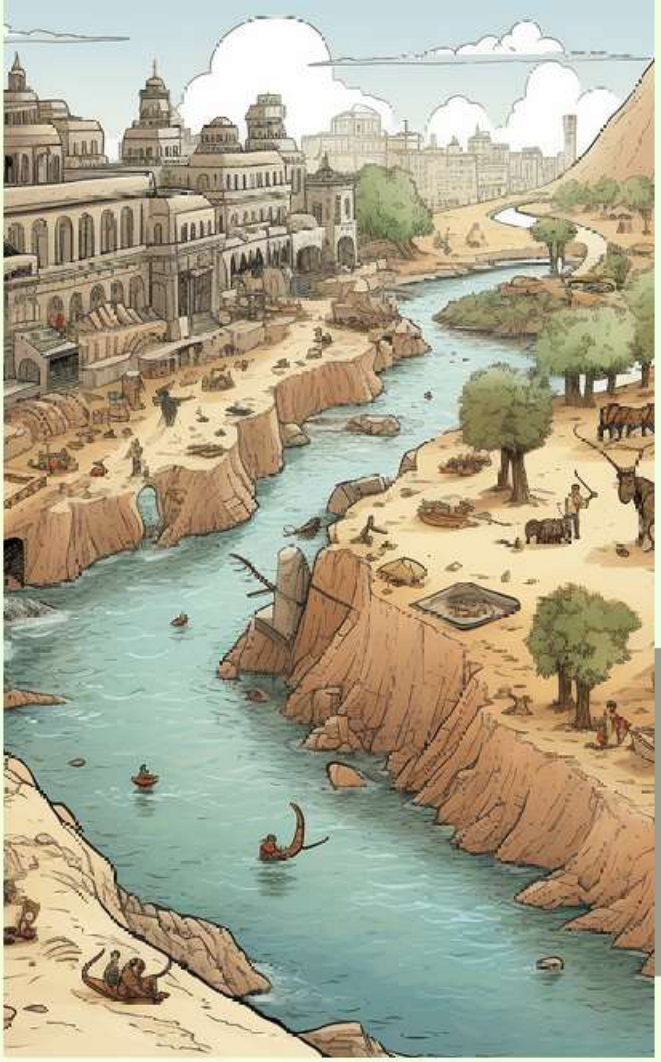
According to an article in a magazine written by his grandson Sayam Bhadra, Birendra Krishna flunked the audition test of AIR. His nasal voice which later made him the voice, was the result of his catching diphtheria at an early age. Had his voice not been selected for the role of a rakshasa (demon), his magical voice would have been unknown to the general public!

What is amazing is the fact that the program was broadcast live from 1932 to 1962 with a full orchestra playing. The rehearsals went on for about a couple of months till broadcast day, The program began at 4 AM every Mahalaya. Birendra Krishna Bhadra, freshly bathed from the Ganga, and dressed in spotless dhuti and punjabi was in his room in AIR by midnight, with his script — deep in contemplation and at times reading to himself. It was his precious me-time for preparing.

On September 23, 1976, the powers in Delhi decided on a makeover of Akashbani Kolkata's production of Mahalaya, and replaced Birendra Krishna Bhadra with the reigning matinee idol Uttam Kumar.

Minutes after the new broadcast began, a deluge of protests — angry, indignant phone calls — poured into Akashbani, Kolkata, then in Garstin Place. It was followed by countless letters to the Station Director in Kolkata. It did not take long for the bureaucrats to realize their colossal misjudgment of aesthetics and the pulse of the audience. The program was promptly restored to its original form. ... And even today Birendra Krishna's fabled voice resonates in the minds and hearts of all Bengalis who have had the good fortune to listen to Mahisasurmardini.





On Hinduism

Asit Narayan Sengupta

Asit Narayan Sengupta, is one of the oldest Bengali residents in Atlanta. He is an internationally known architect-planner, responsible for planning diverse projects. He lives with his wife and also spends time with his two sons. He enjoys the company of good friends and likes to read and write.

Recently, I received an e-mail from one of my sisters about Hinduism. This prompts me to write this brief note based on what little I know and understand about Hinduism. I must confess at the outset that because of antiquity, lack of written documentation of events which happened some 4000 years ago and earlier, in and out migration to and from India, writings by many authors in comparatively recent centuries and the developing nature of Hinduism itself, it is not possible to pin down facts and figures with definitude. Even the word, "Hindu" is a mis-pronounced (by the invading Aryans?) version of "Sindhu", the major river in northwest India.

Hinduism is the joint flow of two rivers of thought or philosophy. One, that came with the nomadic Aryans from the northwest of India. These people, being nomadic, related their thoughts with the Sky and Nature in the broadest sense of the words. Their thoughts are closely related to "Dhyan" yoga or abstract thoughts and "Gyan" yoga or knowledge, in Hinduism. The other flow seemingly originated from the settlements-based (Like in Mohenjodaro and Harappa) way of life—complete with assumed divinity of all down-to-earth

phenomena, including fear and dangers, victory, disease, knowledge, wealth, and so much more, all of which were given forms as idols. These thoughts essentially form the basis of "Bhakti" yoga or devotion and "Karma" yoga or deeds. This truly vast range, which developed over many centuries and intermingled, allows Hindus to select their preferred ways to live and pray, if you will. In fact, one need not go to a temple to practice and yet one can surely do so.

Hinduism is not a religion in the conventional meaning of the word. Even the Sanskrit word "Dharma" means principles to live by. Hence it develops with time and place. It does not have one prophet, whose teachings are the core of the religion. It does not even have one unchanging book to follow as the Holy Book.

However, there are many books related to Hinduism, which together cover both the abstract concepts, which are followed by a minority as well as the living or concrete concepts in the form of great epics, which are followed by the majority through their varied interpretations.

Examples of the books on the first or abstract concepts are the Vedas and the Upanishads. The Vedas were written in Sanskrit between 1200 and 400 B.C., obviously by many authors. They deal with rituals including mantras (sacred utterances), sacrifices and ceremonies to be followed by the Hindus.

These books also contained sacred knowledge as well as scientific knowledge. We do know that ones who had such knowledge would have special authority. They were called Brahmins. Caste system in which people were categorized essentially according to their work came essentially at the same time. The Upanishads which followed in around 700 and 400 B.C. turned towards spiritual knowledge and philosophy, which relate even to the Cosmos. Like the Vedas, these were also written obviously by many authors.

Herein lies a great strength of Hinduism. Having been often composed and passed on orally and written over centuries by many authors, the religion remained and remains dynamic, hence very alive.

Examples of the books on the latter or living or concrete concepts are the Ramayana and the Mahabharata, which also contain the Bhagavat Gita, the Song of God. The Gita is viewed by many as the essence of Hinduism. In it Lord Krishna famously declares, "Whenever Dharma suffers, and evil rules, I create Myself, to protect the pious and to destroy the evil-doers and to re-establish Dharma, I return age after age". Lord Rama in Ramayana and Lord Krishna in Mahabharata are viewed upon as God Himself. In different parts of India, there have been great individuals, who are worshipped as the messengers of God or prophets.
Krishna's saying above also affirms

the Hindu notion of rebirth of the soul, which is indestructible, again and again, in a physical body on this very Earth. It is believed that through noble thoughts and deeds one can break this cycle and the soul becomes free and merges with God.

A very interesting aspect of Hinduism is that Hindus often establish relationship with the many gods and goddesses in family terms, like father, mother, brother, sister and a child. Often, they welcome these "family members" by way of making idols of them, establishing life through worshipping, afterwards saying goodbyes and subsequently immersing these idols. This process is repeated year after year. However, worshipping takes place in most homes throughout the year, using small idols or pictures of idols.

In Hinduism there is no question about which religion is superior or inferior. The great interpreter, Sri Ramakrishna, considered as a prophet by many, famously said, "Joto mot, toto poth", meaning "as many opinions, so many ways". To underline what he meant absolutely clearly, he practiced several religions other than Hinduism, in which he was born.

Originally the Hindus believed that the Earth was flat and floating in an ocean, from which the Sun and the Moon rose as well as set in. God Himself and the many gods and goddesses lived in Heaven, situated above the clouds or on mountain peaks. Many natural phenomena like the eclipses were viewed as demons swallowing the Sun and the Moon. These beliefs are not unlike those in several other religions. Since Hinduism Is essentially a way of life, not bound by any one book or even any one Prophet, there has been no difficulty to embrace science and continually modify beliefs.

However, in the ever-changing world, Hinduism finds permanence in the myriad of temples and even elaborate temple-towns, and in sacred mountains, rivers and the eternal Sky, in which time stands still. To talk about these will demand another story.



Inferno of the Century

Tapan Baksi

A Mining Engineer from IIT, Kharagpur, India, he resides with his wife Mitali who is a Pathologist, in picturesque Barboursville, West Virginia.

It was Tuesday, September 11, 2001. The New York sky was bright and clear. There wasn't the faintest inkling that this was to be one of the darkest days in modern times. At 8:45 AM a series of cowardly, inhuman and dastardly terrorist attacks was unleashed. Also called the 9/11 attacks, the carnage shocked and horrified the USA and the world. Nineteen al-Qaeda suicide terrorists hijacked four commercial airplanes full of passengers, deliberately crashing two of the aircraft into the upper floors of the North and South Twin Towers of the World Trade Center complex in New York City (Twin Towers 1 WTC and 2 WTC).

A third plane rammed into the Pentagon in Arlington, Virginia while the fourth crashed in a field in Shanksville, Pennsylvania. Apart from the 19 hijackers, the number of innocent people who died was 2997. 15 hijackers were citizens of Saudi Arabia, 2 were from the United Arab Emirates, 1 from Egypt and 1 from Lebanon.

The 2 towers were 110 stories and over 1,400 feet tall, designed by Minoru Yamasaki. They took 15 years to complete and were commissioned in 1977. They were the workplace of 50,000 individuals and drew 80,000 tourists a day!



My wife and I visited the towers a few months before the attack, and enjoyed the enthralling and panoramic view of New York City. We remembered Liza Minnelli's song "King of the hill, top of the heap". If you ate at the restaurant on 107th floor, you would dine literally with your heads in the clouds.

At approximately 9:30 that morning I went to the DEP (Department of Environmental Protection) office at Welch, WV, for a permit inquiry. To my surprise, instead of working, all the employees were glued to the TV. I was astonished and turned to the TV. To my horror, I saw that the first tower was in flames. With a chill gripping my heart and feeling weak at the knees, I sank into a nearby chair and gasped "Oh my God, my daughter works there". An excruciating sense of agony, despair and a deep paralyzing fear overcame every fiber of my being. I hope nobody else goes through this traumatic experience. Seeing my despair, everyone rushed to my side eager to help. I was speechless for a while and then said "Someone please call Senator Rockefeller's office in New York City. They may be able to trace my daughter". DEP employees instantly jumped to the phones. But there was no response from the other end. Nobody, and I mean nobody, picked up the phone!

In the meantime, Anu the Mesopotamian Sky God bore agonized witness to the horrific New York sky and the ghoulish signature of nineteen misguided, malevolent Middle Eastern terrorists. It appeared as if Dante's inferno had come to life. The sky was ablaze, consumed by flames, smoke, fumes and dust. People were trapped in the twin towers. Intolerable heat and smoke forced them to jump in sheer desperation from enormous heights to the streets below only to end up as mangled, eviscerated carcasses scattered all over! Did those nineteen youths go to heaven as promised?

When I returned to my office in Gilbert, friends tried to help me by calling different places including the Senator's office. It was all in vain. Finally, at about 2:30 PM my brother called me from New York. He had received a phone call from my older daughter, Adra. Thank God, she was safe.

Ardra, was born in 1977. She was educated at a local high school and

then at Johns Hopkins University. She was working in the Twin Towers in September, 2011. It was then
that she came within inches of this catastrophic disaster which left a permanent mark on her mind. When I asked her to write a few words about her chilling experience on 9/11, she texted:

"I think it's great you are writing. Sharing your stories and perspectives is unique to you. So, I think hearing your voice and YOUR experience of 9/11 is more meaningful than having an excerpt of someone's take of the event and emotions around it, outside of your own.

It's so emotionally draining to relive a traumatic experience. I would rather save it for therapy, if I ever feel the need to rehash or talk about it in detail again.

Until then, I would like to move on and only take time to observe a moment of silence and connect with loved ones on the anniversary every year."

I feel greatly blessed that my family survived this trial by fire and the agony of 9/11. My heart aches for the thousands of others less fortunate, who continue to try and cope with their irrevocable losses and perennial pain. The Twin Towers collapsed at 10:07 and 10:27 a.m. The Towers have been replaced, but there remains an open wound, an indelible scar to remind us of a real-life horror story we shall never forget. May all those who unwittingly lost their lives Rest in Peace. And may all survivors find comfort in prayer.

The Twin Towers were obliterated. Some other buildings still stand adoring a different New York skyline, some buildings arose like ragged and amputated pyramids. The replacement of the Twin Towers has an eye-catching view. One World Trade Center, the so-called Freedom Tower in Lower Manhattan, technically became New York City's tallest building, reaching 1,776 feet with 104 stories! It is a proud monument to the human spirit and courage, a triumph over terrorism and hate, disdain for the heinous and cowardly attack of 9/11. It's a tribute to the innocent lives stolen so senselessly by the poisonous indoctrination of some twisted and evil puppeteers!



"Tribute in Light," a temporary public art installation of 88 xenon lightbulbs which, when illuminated, approximated the shape and orientation of the twin towers of the World Trade Center.

Finding ME

Payel Bhattacharyya

Payel is a resident of Georgia for the last three years. As an English major and a bibliophile, writing is just organic to her. Poetry to her is a literary embodiment that is crisp, sublime, and unbroken.

I am walking backwards, to an age-old place called ME.
Deep down my heart says: 'ME is a beautiful place to be!'

I have long forgotten the way; now there's no map to guide.
When I face the unforeseen, I swiftly run and hide.

I am not very sure of the distance or the time this may take.
Will I survive the journey? Ready to take a break?

My path is very baffling; doubts and fears are constant friends.
I hold their hands and keep striding; maybe, they won't be there till the end.

Sometimes, I feel I have been walking this road many times before,
Losing myself always, never knowing what's there in store.

Now, when I finally reach ME, I am not sure what to find?
Different versions of ME perhaps, I will try not to judge them or mind!

But I will complete this journey; no matter how or what it takes, and
Embrace the ME for what it's worth, absolve, revere, and never forsake!



Behavior Therapy

Oyindrila Basu

She is a Registered Behavior Therapist with an MS in Psychology and is currently pursuing her second Master's in Applied Behavior Analysis to become a Board Certified Behavior Analyst.

Role of Behavior Therapy in Shaping Verbal Behavior of Children with Autism:

Last time I was in India in 2021, I met my aunt's younger nephew who is 4 years old, but he is non-verbal. He can utter sounds and broken words, can recognize people, phone numbers and writing, but cannot communicate with them in the way people expect a 4-year child to do.

"We both are working parents; probably our child cannot speak because we haven't given him enough time during his growing years into communication. We regret, but what can we do? He likes watching iPad but we want him to talk, to communicate with us, tell us what he wants, tell his friends that he wants to play with them. But we don't know when is he going to get better, we want to send him to school."

I realized there has been no psychological or physiological assessment of the child to determine symptoms of autism spectrum disorder. According to CDC, 1% of the world population has autism spectrum disorder and the rate has increased by 178% since 2000 (Zauderer, 2022). However, it is unfortunate that most countries do

not have enough awareness or education to conduct a proper diagnosis for autism, outside US. That is why, most number of cases diagnosed and documented are from US, and about 3% of the cases are diagnosed in Canada, UK and Australia. US is the only nation to have standard board for credentialing the behavior therapists and the behavior analysts that work one on one with the children and their families on intervention programs towards improving their developmental disorder. According to Economic Times, 18 million Indian people are affected with autism, 1 to 1.5 percent children in the age range of 2-9 years are autistic (ET Online, 2023), however, the education and knowledge required for progress is lacking.

In rural India, neurological or mental health disorders are considered a taboo, therefore it stays largely undiagnosed (Verma, 2017). Even in Indian cities, people accept their fate that the children are compromised into natural, normal existence and they have to stay that way; there is no way they can get better. The regressive thinking has forced children to leave school, studies and peers. Added pressures from social stigma in the neighborhood, compel parents to keep their autistic children inside home, within the doors as if they are a menace to the society. At a decision-making level, India has restricted funds for the development of children with autism, most of which comes from privatized agencies and non-governmental organizations; there is extremely limited support from the national level in funding programs aided towards autism (Verma, 2017). I feel extremely distressed when I know that each of these children can get better, and will get better with a little help, but that help is not available outside western nations.

Behavioral interventions based on Applied Behavior Analysis and medications are often used to manage symptoms of autism. Early intervention programs can improve the cognitive and language skills for children with autism. I had a client in our clinic who was 2+ years of age, and could not utter a single sound. He could not respond if anyone called, would always be distracted and socially isolated, somewhat shy and scared too. In short, there was no response from the child whatever stimulus was presented to him. However, with an intensive behavioral intervention program directed towards his communication, the child progressed miraculously within 3 months of being in the clinic. Now he was exploring everything, touching and feeling sensations of objects, responding to name with eye contact, imitating and also uttering so many words especially one-word mands like “push”, “bubbles”, “swing” and “jump”. His social communication had improved drastically, which was so refreshing to watch as a direct therapist to the client.

The estimated lifetime cost of caring for an individual with autism as of 2013 is between $1.4 million and $2.4 million, using data from the United Kingdom and the United States (Wikipedia, n.d.). In the US medical system, full to partial compensation for treatment of autism is paid by the insurance based on the initial diagnosis and assessment of the child, and on the plan of care chosen. Some western countries provide fully sponsored autism programs, subsidies in occupational and speech therapies, social skills groups, special schools. In the United States, more than $200 million are allocated towards research and services (Verma, 2017). However, such facilities are unavailable to most other countries like India, Qatar, Africa and most of the middle-eastern nations, but the amount of people affected are the same. It is important that we speak more about the issues, the symptoms, the pain and distress of the autistic children and put our brains in researching about new ways to cure the different developmental problems that come with autism.



In reference to the case, I mentioned above, I want to elaborate on how Applied Behavior Analysis can help with the verbal behavior of children, and make them vocal from a completely non-verbal situation. Applied Behavior Analysis is also known as behavioral engineering which functions on the principles of Behaviorism to change respondent behavior of an individual using mostly operant conditioning (Wikipedia, n.d.). Operant conditioning means that every behavior has a consequence whether positive or negative. For e.g., when a child touches a hot pan, he/she instantly feels a painful heat and removes his hand, i.e., responding to an unconditioned stimulus. The next time the child sees a pan sitting on the stove top, he will likely not touch it because the consequence from the previous experience will direct the brain to stay away from anything that is placed on the stove, even if gas is off. In this way, the child learns a positive behavior that it is unsafe to touch hot objects on the stove.

Behavior shaping starts with stimulus control. A stimulus is any non-verbal item, event or person that is in the environment for e.g., our phone, our laptop, a red book, some noise outside etc. are all stimuli; control refers to how we respond to each stimulus (Razdan, 2023). There are so many stimuli in our environment; we behave in a certain way in presence of some, and in

different ways in the absence of them. For e.g., we see a red traffic light, which is a stimulus in our environment, and it triggers our brain to stop the car. Every time we see a red traffic light, we stop the car; that is stimulus control which means we do the same behavior consistently in the presence of a specific stimulus, however, when the traffic light is green, we do not stop, we move, and that is referred to as discrimination of stimulus (Razdan, 2023).

Now let us understand how that is helpful in behavior shaping. Say, dinner time is 7pm and a child's mom takes him to the dinner table at the same time every day. She gives her a cupcake when the child finishes his main food. It is likely that after a few days, the child will walk to the dinner table by himself when the clock strikes 7, because he knows its dinner time after which he will get a cupcake. The time 7 o' clock on the watch influences the way the child responds. However, there is another factor at play, reinforcement. The cupcake is the reinforcement which the child enjoys, so he will do the positive behavior of going to the table at dinner time and finishing his food, so that he can get the cupcake. To shape a behavior, we have to reinforce every positive occurrence of the behavior or even approximation of that behavior. This is how a behavior is sustained and new behaviors are created into habit overtime for the entire life.

To understand verbal behavior, let's talk about the verbal operants that are mostly in play. There are 5 main operants of verbal behavior which include mand, tact, listener responding (LR), echoic/imitation/social play and intraverbal (Razdan, 2023). For an early learner who is totally non-verbal, we usually start with echoics where they will imitate simple sounds following the therapist or any adult in the environment. From sounds they move upwards to half words, then one words. Alongside, we need to work on their receptive skills i.e., whether or not they are able to identify objects, discriminate them and label them. Even though listener responding with receptive identification may seem a non-verbal skill, but we must not forget that all these stimuli help us form language. We can learn to say orange only when we see the picture of orange in our fruit book, see the real item in the kitchen and may be also hear songs or videos about orange. If there was no orange around us in any shape or form, we would never know what an orange is, so that word would be irrelevant and meaningless for us, hence we would not learn to say it too. Therefore, when we teach kids language and verbal communication skills, we try to incorporate goals, i.e., words or phrases that are meaningful and functional to them, and will be reinforced in their natural environment.

Going back to echoics, which are the visible verbal skills. The child's intervention plan may have imitating simple sounds like "ahhhh", "ayyyy", "ohh", "mmm", "boo" etc. That means, when the therapist places command "Say ahhh", the child repeats "ahhh", and the therapist immediately uses a high verbal praise "great job saying ahhh", and gives a cheeseball or candy for the child's response. The next time the child will try harder to imitate "ahhh" to get his reinforcement and the process continues till the child is able to utter "ahhh" independently and immediately after the command (also called SD), without repeated verbal or phenomic prompts from the therapist or adult. Listener responding skills involve matching and identifying different identical and non-identical objects. For e.g., therapist presents the child with an array of 5 cards with pictures and commands "show me ball"; if the child points to the picture of the ball, the therapist praises him and gives him his reinforcement again. If he is not able to say, the therapist first points towards the ball to gesturally show the child, and then takes his hand and place it on the picture of the ball to physically prompt him. After the prompted response too, the therapist gives him a praise "great job trying", but does not give the reinforcement of the candy. This is called differentially reinforcing a behavior to make the correct response more consistent and intervention more effective. Such listener responding goals help shape the vocabulary of the child which he is able to use in communication throughout his life.

After a skill is learned, it needs to be generalized, that means the same behavior need to be repeated in every environment with a specific stimulus. Here comes the phase of stimulus transfer. A child who has learned about ball by imitating 'ball' or matching ball images, they need to be able to pick a ball from their natural environment when asked to do so. Now if a child is playing with his peers in the neighborhood, mom shows him a ball and asks "what is it", the child should be able to respond "ball" because he has learned the vocal language structure of the word "ball" through imitations and LR and also the visual perceptual identification of the object. Similarly, if a peer asks him, "give me the ball", the child should be able to pick up the ball present on the ground and hand it to him. This means stimulus transfer has occurred from visual and verbal form to real object form in the natural environment. However, phase of generalization may take time based on who is placing the command/demand, what is the demand in place and how receptive is the child towards different stimulus discriminations. At any level and situation, every correct and positive response the child gives on the item ball should be reinforced. That is if

Atlants's Renowned South Asian Caterer with Distinction

Specialty Catering in
Punjabi, Pakistani, Gujarati, South Indian, Fusion
Continental, Chinese, Mexican & Italian





Celebrating our Clients Everyday!



Impress your guests with memorable catering and pesntation!



Discover a new flare of tasteful sensation at your next event!



Experience the extravegance of gourment South Asian & Fusion Catering

Special for BAGA Community 10% off on all catering!

Wedding Receptions, Mehndi, Sangeet/Garba, Pithi, Engagements, Birthday Parties, Corporate Meetings, Full Service & Much More...

Dinesh
CHEF DINESH CAFE
ATLANTA

Chef Dinesh
CATERING

dinesh4you1987@gmail.com
ChefDineshCafe
(678)615-2882 | (646)647-8867
www.chefdineshcafe.com
www.chefdineshcatering.com

Dinesh Cafe Website:

Catering Website:

Buying - Selling - Advice

Always at your service





Sushanta Saha
Realtor

Your Trusted Real Estate Partner

Mobile: 678-393-0450
Email: sksaha@kw.com
Web: https://sushantasaha.kw.com

kw NORTH ATLANTA KELLERWILLIAMS

PRINT N SIGNS



SMOKER'S HUT
SMOKE & VAPE

VISIBLE





- VINYL BANNERS
- FEATHER BANNERS
- MURALS & INTERIOR SIGNS
- CHANNEL LETTERS
- WINDOW GRAPHICS
- CATALOGS & BOOKLETS
- TABLE THROWS
- POSTERS
- INVOICES
- A-FRAME
- LETTERHEADS
- AND MORE

Looking
For Creative
SOLUTION?

404-296-9141

Durga Puja Greetings From

ALL EXTERMINATING
Cumming, GA

Services:

Termites, Pest Control, Mosquito Control, Termite Control, Termite Pre-Treatments, WIIR Letters, Wildlife Control, Gutter Protection, Blowback Insulation, Vent Install, Vapor Barrier, Wood Insulation, Custom Hole Repair, And Many More....

256 Castleberry Industrial Drive
Cumming, GA 30040
PH: 770-887-2571
www.allexterminatingga.com

For All Your Exterminating & Wildlife Needs
Serving North Atlanta since 1989



Art & Photography

image generated by Midjourney.ai

শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন by Indrajit Chowdhury

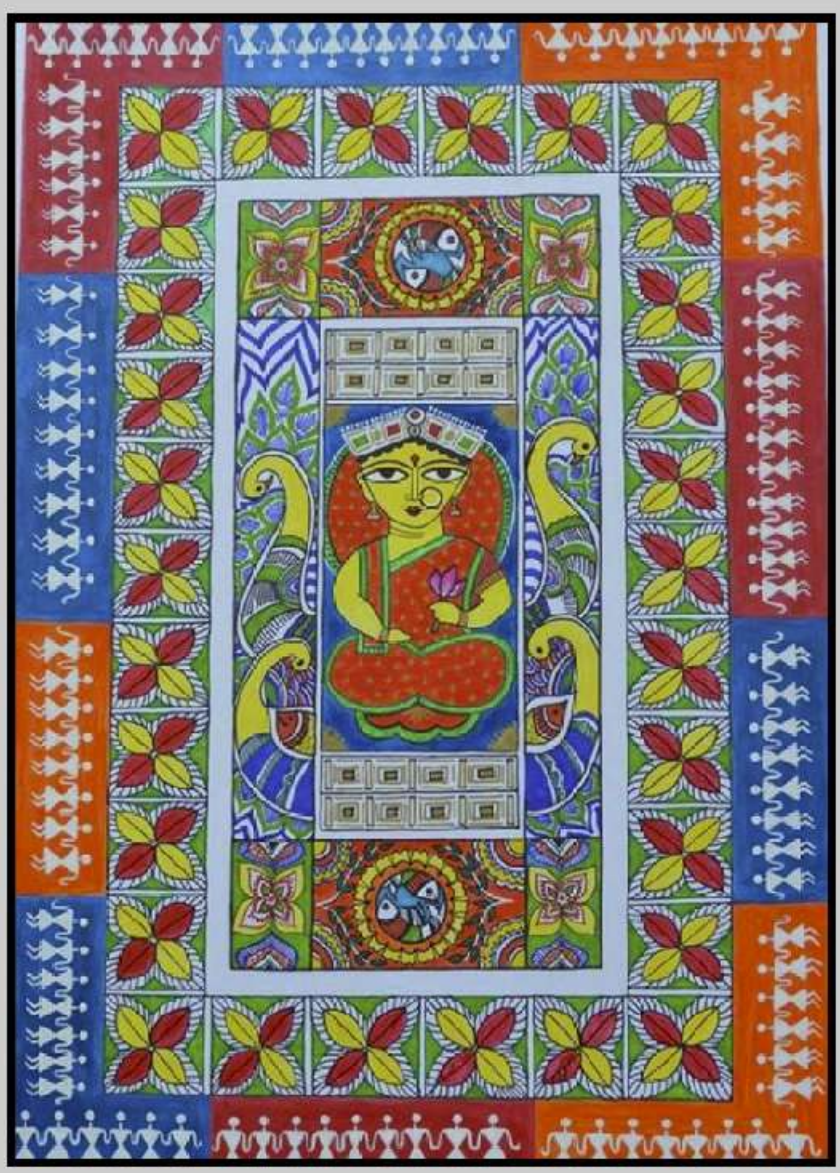




Saradiya Suvechha
&
Best Wishes to All BAGA members



From : Tanushree Guha and Abhishek Mallik Family



Lokochitre Maa Durga
by Anindita Roy Biswas

This Maa Durga Painting is inspired by Indian folk art. Its a combination of Madhubani and Warli art. The medium used -acrylic, poster color and markers.

Mandir
by Parnika Chakraberti

পর্ণিকা চক্রবর্ত্তী প্রায় কুড়ি বছর লরেন্সভিলে আছেন। প্রথম থেকেই উনি এবং ওনার স্বামী 'বাগা'র সঙ্গে যুক্ত। গৃহকর্মের মধ্যে সময় ও সুযোগ পেলেই তিনি ছবি আঁকেন। এটাই তাঁর নেশা।







A Seascape
by Paromita Ghosh
Painting of a lighthouse in Maine.
Oil on canvas.

"ঘরেও নহে , পারেও নহে
যে জন আছে মাঝখানে ,
সন্ধ্যা বেলায় কে ডেকে নেয় তারে ।"

Photography by Moumi Panja



Photography by Sujit Bose







Photography by Sujit Bose



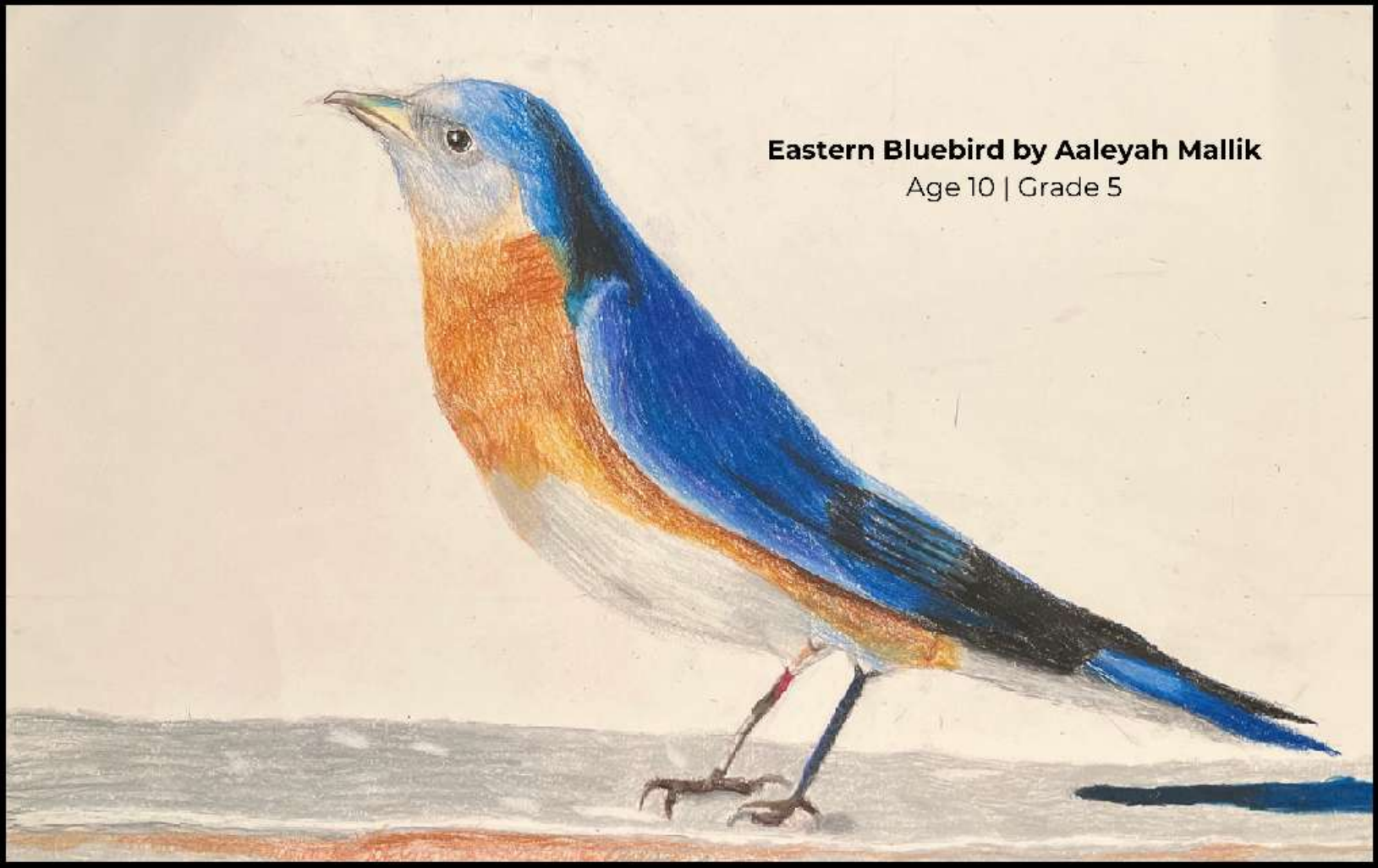




KIDS' ART GALLERY



image generated by Midjourney.ai



Eastern Bluebird by Aaleyah Mallik
Age 10 | Grade 5



Ma Dugga
by Tuhina Chatterjee
Age 8 | Grade 3

Asura Binashini by Nabyanshaa Biswas
Age 8 | Grade 3





"Durga Puja Dhaki and Dhunuchi"
by Nishant Das
Age 12 | Grade 7

Sarat a gram bangla ar durga puja
by Tanisha Podder
Age 11 | Grade 5





Save the Earth by Eshaan Manna
Age 13 | Grade 8



Playing Fish
by
Arin Samadder
Age 11 | Grade 6



The Eagle by Shaunak Hazra
Age 10 | Grade 5



Lotus and Swan
by
Rayansh Das
Age 7 | Grade 2

BAGA 2023 Financial as of 9/1/2023

Accounts	As of 9/1/2022	As of 9/1/2023	Change
Wells Fargo Checking #0344	$4,653.28	$9,000.53	$4,347.25
Wells Fargo Savings #7671	$2,584.90	$2,587.99	$3.09
Wells Fargo CD #0099	$10,418.64	$10,419.68	$1.04
Wells Fargo CD #19281	$15,593.09	$15,594.65	$1.56
Wells Fargo CD #224	$32,899.92	$32,903.22	$3.30
Piedmont CD #31838	$31,700.00	$32,241.04	$541.04
EC Checking	---	$41,432.23	---
BSC Checking	---	$3,280.91	---
BYC Checking	---	$1002.00	---
Total BAGA Asset	---	$148,462.25	$4,897.28

Coverage for the things you care about

- Life Insurance
- Business Insurance
- Commercial Umbrella Insurance



Pam Johnson
Your Local Agent
License # 624111
3225 SHALLOWFORD RD STE 120
MARIETTA, GA 300621283
pjohnson@farmersagent.com

Call 470-275-0777 today!
For a no-obligation quote.

FARMERS INSURANCE

Advertisement produced on behalf of the following specific insurers and seeking to obtain business for insurance underwritten by Farmers Insurance Exchange. Fire Insurance Exchange, Truck Insurance Exchange, Mid-Century Insurance Company, Civic Property and Casualty Company, Exact Property and Casualty Company, Neighborhood Spirit Property and Casualty Company, Farmers Insurance Company of Washington (Bellevue, WA) or affiliates. In TX insurance is underwritten by Farmers Insurance Exchange, Fire Insurance Exchange, Truck Insurance Exchange, Mid-Century Insurance Company, Farmers Texas County Mutual Insurance Company, Mid-Century Insurance Company of Texas or Texas Farmers Insurance Company. In NY insurance is underwritten by Farmers Insurance Exchange, Truck Insurance Exchange, Mid-Century Insurance Company or Farmers New Century Insurance Company. Home office, Los Angeles, CA.

Life insurance issued by Farmers New World Life Insurance Company, 3120 139th Ave. SE, Ste. 300 Bellevue, WA 98005. Farmers New World Life Insurance Company is not licensed and does not solicit or sell in the state of New York.
Each insurer has sole financial responsibility for its own insurance. List of all insurers at farmers.com. Not all insurers are authorized in all states. Not all products, coverages, features and discounts are available in every state and may vary by state. Restrictions, exclusions, limits, and conditions apply. See agent for details.

Past Executive Committee

Year	President	Vice Presidents	Treasurer
2022	Dr. Dimple Majumder	Apala Bandopadhyay Sheuly Biswas Rajib Nandi Sumanta Bardhan	Subarna Chandra
2021	Avijit Saha	Sarbani Samadder Debasree Roy Romeo Laskar Dipankar Chatterjee	Shantanu Paul
2020	Kishore Chakraborty	Shantanu Paul Joyshree Chowdhury Apala Sen Bishan Chandra Avijit Saha	
2019	Subho Nath	Dipanjan Banerjee Kamalaksha Das Moitri D. Sarker Paromita Ghosh Sukla Mondal	Biplab Chandra
2018	Ayan Banerjee	Subhadra Gupta Rajdeep Mondal Mohua Maity	Anirban Majumder

Pratichi 2023 decided to publish last 5 years of Executive Committee members. More information about past executive committee can be found on:
www.baga.net/pastexecutivecommittees

BAGA 2023 Puja Committee

Purohit



Ayan Banerje

Puja Coordinators



Chandra Roy



Devjani Purkayastha



Mala Basu



Soma De

Puja preparations help

Amrita Kumar	Anuva Goswami
Barnali Nandy	Shanta Gupta
Sharon Roy	Somdutaa Mondal
Sutapa Majhi	Suvarthi Bhol

Donations

Fund Raising Committee
Amit Podder
Devi Banerjee
Dharamajyoti Bhowmick
Kiriti Gupta
Kishore Chakraborty
Mamata Paul
Sankar Ghosh
Santa Gupta
Gita Das
Avijit Saha
Abhijit Ghatak

Food & Non-Food Item Donations
Adrija Das
Alolika Dutta
Amar Singh
Amrita Kumar
Anamika Nelakosigi
Anuva Goswami
Arpita de
Arun/Reema Chatterjee
Barnali Nandy
Rajib Nandi
Bipasa Sen
Chandona Basu
Debarati Deb
Debasmita Banerjee
Devi Banerjee
Deblina Chatterjee
Dharmojyoti Bhowmick
Geetanjali Talukdar
Jayita Deb
Joy and Mausumi
Krishnakali Dutta
Arabinda Chakraborty
Madhumita Chakraborty
Maitrayee Bose
Mala Basu
Miyanka Pal
Mohua Maity
Moumi Panja
Moumita Dutta
Myanka Pal
Neha Chatterjee
Nibedita Ghosh
Nita Bose
Nita Mashi
Papiya Dutta
Payel Bhattacharyya
Payel Dutta
Pompee Das
Priyanka Goswami
Purba
Rani Kundu
Reema /Arun chatterjee
Rituporna Banerjee
Ruby Ghosh
Ruchira basu
Saibal Ghosh
Sangita Nandi
Sangita Sarker Dutta
Sarbari Ghosh
Saswati Di
Shanta Gupta
Tanushree Guha
Shoma Chakravarty
Shrabanti Basu
Soma De
Somdatta Mondal
Sonali Sharma
Sreemati Hazra
Sunandini Mukherjee
Sutapa & Swapan Maji
Tandrima Debnath
Tanima bhattacharjee
Tanushree Das
Upasana Sarkar
Payel Dutta

Cash/Check
Anada Rakhit
Anil Chakraberti
Apurba Kanti Roy
Arnab Sanyal
Arpan Mukherjee
Arpita De
Avik Paul
Bibhu Das
Bidip Sinha
Bithun Sen
Devi Banerjee
Dharmajyoti Bhowmik
Dipankar Chatterjee
Dr. Abhijit Ghatak
Kamalaksha Das
Kaushik Bardhan
Mamata Paul Mridul Paul
Avijit Saha
Mousam Ghosh
Niranjan Talukdar
Pradeep Bhattacharya
Rahamania Halal Meat
Rahul Barua
Rajib Auddy
Reshma Williams
Ruby Ghosh
Saikat Nandy
Sajal Chattopadhyay
Sandip Saha
Sangeet Bitan
Sanjukta Ray
Sarbani Samaddar
Soumadip Das
Sourav Gupta
Subhdra Majumdar
Sudip Chandralekha Mukherjee
Sujit Basu
Surojit Bandopadhyay
Tanushree Guha
Deblina Chatterjee
Yasmin Ghosh

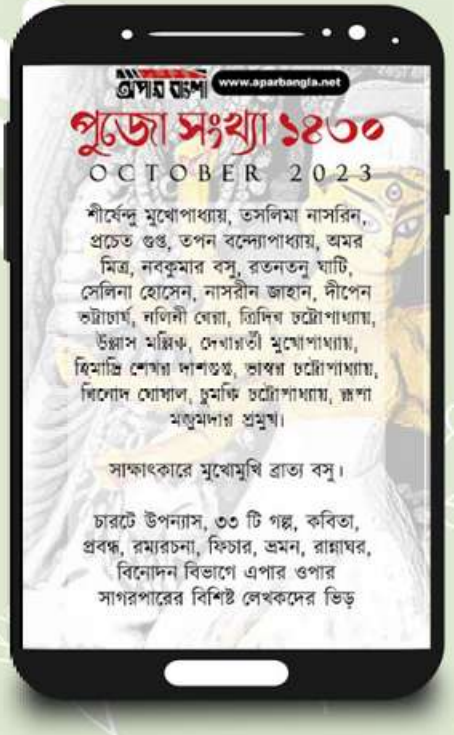
We sincerely apologize if we have missed any name . Please contact with any of the EC or Pratichi team members. We will update this list periodically on our website to include all names that are brought to our attention.



অপার বাংলা
www.aparbangla.net

পুজো সংখ্যা ১৪৩০

OCTOBER 2023



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, তসলিমা নাসরিন, প্রচেত গুপ্ত, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র, নবকুমার বসু, রতনতনু ঘাটি, সেলিনা হোসেন, নাসরীন জাহান, দীপেন ভট্টাচার্য, নলিনী বেরা, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, উল্লাস মল্লিক, দেবারতি মুখোপাধ্যায়, হিমাদ্রি শেখর দাশগুপ্ত, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, বিনোদ ঘোষাল, চুমকি চট্টোপাধ্যায়, রূপা মজুমদার প্রমুখ।

সাক্ষাৎকারে মুখোমুখি ব্রাত্য বসু।

চারটে উপন্যাস, ৩৩টি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ফিচার, ভ্রমন, রান্নাঘর, বিনোদন বিভাগে এপার ওপার সাগরপারের বিশিষ্ট লেখকদের ভিড়

অপারবাংলা পত্রিকা পড়ুন
নিজের মোবাইল/ল্যাপটপে
সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

সেরা অপারবাংলা

বিগত ৫ বছর ধরে আটলান্টা থেকে প্রকাশিত
অপারবাংলা ওয়েবজিনের
(এপার ওপার সাগরপারের বিশিষ্ট লেখকদের নিয়ে)
থেকে বাছাই করে সংকলন বই
প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার
পত্রভারতীর পক্ষ থেকে।

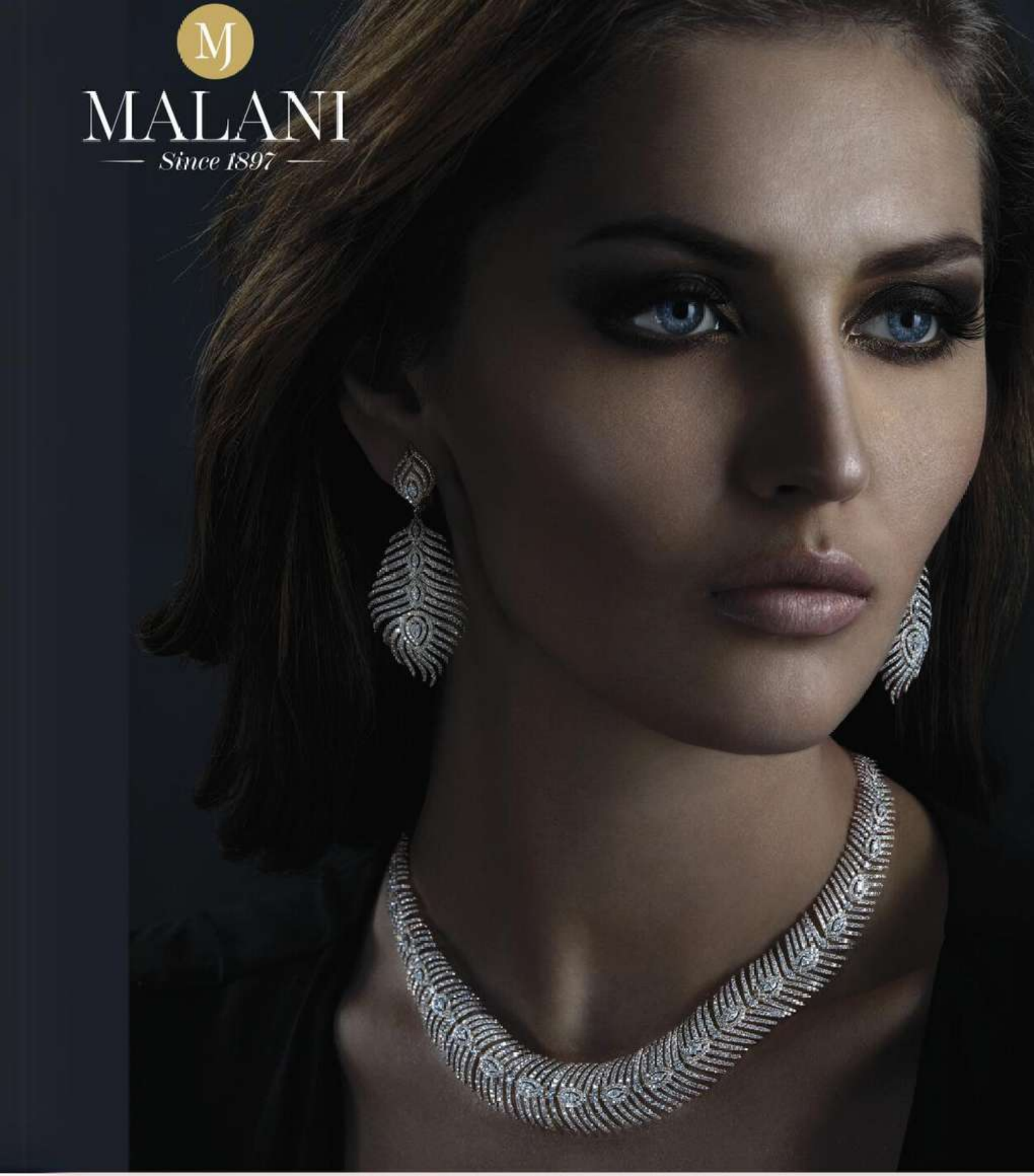


মূল্য
$20

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন:
শুভ নাথ
678-823-5738

www.aparbangla.net


27TH INVESTMENTS
POLITEK USA
CAR REFINISHINGS
cares
27TH GROUP PROPERTIES
27TH SPORTS
LUCKY BUCKS
GAMING GROUP
27TH ENTERTAINMENT
27TH VENTURES
FUSION
GROUP GAMES
JACKPOT
SOFTWARE
www.27invest.com
1.855.742.2727
2299 PERIMETER PARK DR #110, ATLANTA, GEORGIA 30341



EXPLORE OUR EXCLUSIVE

ROSE GOLD DIAMOND JEWELRY

SHOWROOMS IN ATLANTA, DALLAS & TAMPA

SHOP NOW WITH THE BEST BRAND IN NORTH AMERICA!

404.298.7811